"গ্রামীণ ভূমিহীন মহিলাদের উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা"

এম. ফিল . গবেষণা অভিসন্দর্ভ ১৯৯৫ইং

তত্ত্বাবধায়ক ঃ ডঃ বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

অধ্যাপক ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

GIFT

Dhaka University Library

382793

382793

গবেষক

উম্মে আসমা

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৯-৯০ ইং

রেজিঃ নম্বর ১৪৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

পৃষ্ঠা

সুচীপত্র ঃ

পূর্বকথন ঃ

মুখবন্ধ ঃ

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা/তাত্বিক পরিপ্রেক্ষিত ৭

দ্বিতীয় অধ্যায় গ্রাম ঃ পটভূমি, গ্রামীণ নারী ১৮

তৃতীয় অধ্যায় ঃ গ্রামীণ ভূমিহীন মহিলা/অর্থনৈতিক উন্নয়ন/ বৈদেশিক সাহায্য ৩৬

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ঋণদান পরিস্থিতি/ কর্মসংস্থান/ আয় বৃদ্ধিমূলক
তৎপরতা ও ভূমিহীন মহিলা, উপসংহার ৫৯

382793

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঃ সারণী সমূহের তালিকা ঃ

১। বৈদেশিক সাহায্যের অনুদান ও ঋণের পরিমাণ (৯০–৯৩ইং)
২। ১৯৭১–৯৩ পর্য্যন্ত পণ্য খাদ্য ও প্রকল্প সাহায্য
৩। জনসংখ্যার বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন
৪। স্কুলগামী নারী ও পুরুষের শতকরা হার
৫। ১ বিঘার নীচে ভূমির মালিকানা
৬। গ্রামীণ জনসংখ্যার পেশাগত অবস্থা
৭। পরিবারের মাসিক আয়
৮। পরিবারের খাদ্য গ্রহণের বার
৯। নারীর ও পুরুষের বৈবাহিক মর্যাদা
১০। নারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা
১১। আশার সংগে সংযুক্ত ভূমিহীন নারীদের বয়স
১২। ভূমিহীন সমিতির নারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা
১৩। ভূমিহীন সমিতির সদস্যদের বর্তমান পেশা

382793

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কেসস্টাডির তালিকা

১। অবহেলিত নারী/ আশা/ বর্তমান অবস্থা
২।দরিদ্র ও অসহায় নারী/ আশার ঋণযুক্ত আয়বৃদ্ধি প্রকল্প
৩।নিপীড়িত নারী তার স্বনির্ভরতার প্রচেষ্টা এবং বৈদেশিক সাহায্য
৪।নির্যাতিত ও প্রতিবাদহীন রমনী ও আশার ঋণ
৫।আশা/ সচেতন নারী এবং তার ক্ষোভ

পূর্বকথন

বাংলাদেশের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে মহিলারা অধিকারবঞ্চিত, অবহেলিত ও নির্যাতিত। সামাজিক মূল্যবোধ এবং ব্যব্যস্থাদি এমনভাবে তৈরী যে নারী স্বীয় ভাগ্যোন্নয়ন কিংবা অবস্থার পরিবর্তনে অগ্রসর হতেও দ্বিধান্বিত একজন নারী হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রের বেড়াজালের মধ্যে বেড়ে উঠতে গিয়ে প্রতিনিয়ত নারীর জীবনের বিভিন্ন সমস্যায় আবর্তিত হয়েছি এবং পারিপার্শ্বিকভাবে অবলোকনও করেছি। "খুব মজবুত সামন্ত ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত একটি গ্রামীণ সমাজে মেয়েদের অধিকাংশই চরম দারিদ্র এবং বঞ্চনার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। উৎপাদনশীল সম্পদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ এবঙ তাদের শ্রমের ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের ভোগের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। অতিরিক্ত অর্থনৈতিক শোষণের বিভিন্ন শাসনরীতির নিগড়ে তারা আবদ্ধ। মেয়েদের উপর আক্রমনের পিছনেও একটি সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক কারন আছে যা মেয়েদের পরাধীন করে রাখে, বাড়ীর বাইরে যেতে বাধা দিয়ে নানান আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে এবং তাদেরকে বাধ্য করে খুব সামান্য মজুরীর এমনকি বিনা মজুরীর কাজ করতে।"১ আর এ সমস্ত বিষয় নিয়ে বরাবর আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে কেন আমাদের সমাজে মহিলারা এত পশ্চাৎপদ? তারা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী নন কেন? কেন তারা প্রতিবাদহীন? নারীও যে একজন মানুষ এটি কি কোনদিন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে? এর জন্য কিইবা প্রয়োজন। নারীর জীবনের আমুল পরিবর্তন না আংশিক উন্নয়ন? এ বিষয়ের সাথে এটিও মনে হয়েছে এ প্রশ্নগুলোর সুদত্তর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এর জন্য প্রয়োজন গভীর অনুসন্ধান এবং গবেষণা।

নারী বিষয়ক এ ধরনের সচেতনার কারণেই নারী সংক্রান্ত যেকোন বিষয় আমার কাছে সবসময় আকর্ষণীয় ছিল। বিশেষত: বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকালে নারী উন্নয়ন, নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, বৈদেশিক সাহায্য এসব বিষয় জানার সুযোগ হয়। তখন থেকেই আমার প্রবল ইচ্ছা ছিল কখনো গবেষণাকর্মে সংযুক্ত হলে নারী এবং বৈদেশিক সাহায্য হবে আমার বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দু।

এরি মধ্যে ১৯৯০-এ এম, এস, এস পাশ করার পর যখন এম, ফিল প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য সিনোপাসিস তৈরী করবো তখন বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী উভয় পর্যায় নারী উন্নয়নের প্রক্রিয়া ও প্রকল্প বিদ্যুৎগতিতে চলছিল। সমাজ সচেতন অনেক গবেষক তদ্দিনে বৈদেশিক সাহায্য, নারী উন্নয়ন, নারীর অংশগ্রহণ, পশ্চাৎপদতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষনাকর্মে সংযুক্ত হয়েছেন। আমার মনে হয় এ ধরনের বিষয়ের গবেষণা সামাজিক দায়বোধ থেকেই করা উচিত। নারী বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণার অসম্পূর্ণ দিক নিয়ে সমাজবিজ্ঞানী কিংবা গবেষকগণ তাদের সচেতন প্রয়াসের মাধ্যমে সমাজের বৃহত্তর কল্যানার্থে অবদান রাখতে পারেন। এ ধরণের বোধ ও আকাংখা থেকেই আমার এম. ফিলের সিনোপাসিস এ নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক সাহায্য এ দুটি বিষয় গুরুত্ব পায়। আমাদের সমাজে পুরুষ উপার্জন করে, অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব তার হাতে এবং নারী পুরুষের উপর নির্ভরশীলতার কারণে পরিবারে তার ভূমিকাও অধীনস্থের মত। অথচ পারিবারিক পরিসরে নারীর শ্রম পুরুষের তুলনায় কোন অংশে কম নেই। যেহেতু গার্হস্থ শ্রমে আজও তার মূল্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়নি সুতরাং নারীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অবদান রাখা উচিত এ বোধও আমাকে এ বিষয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী করে তোলে। তুদপরি আমরা জানি বাংলাদেশ বৈশ্বিক পুঁজিবাদী বলয়ে অন্ত:স্থিত একটি দেশ। এদেশের উন্নয়ন কমকান্ড মূলত: বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর। বৈদেশিক সাহায্য সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রক্রিয়া এদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে (মাইক্রো ও ম্যাক্রো) ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে। সঙ্গত কারণে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্যের যে প্রবাহ তা এদেশের সমাজ ও অর্থনীতির গভীরে শিকড় গেড়ে নিয়েছে। বিশেষত বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষর ও দরিদ্র গ্রামীণ নারীর জীবনধারা এ উন্নয়ন সাহায্য দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছে এবং তাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কি ধরণের পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে সেটা জানা আবশ্যক। কারন বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী উভয় পর্যায়ে নারী

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রামীণ দরিদ্র নারীকেই টার্গেট করা হয়। বিশেষ করে বেসকারী পর্যায় এন.জি.ও সমূহের ভূমিকা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

আমি সামগ্রিক দিক বিচার করে আমার বিষয় নির্বাচন করেছি "গ্রামীণ ভূমিহীন মহিলাদের উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায় ভূমিহীন পরিবারের নারীদের আয়বৃদ্ধিজনিত প্রকল্পের সংগে সংযুক্ত করে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে। যদিও আমি জানি সম্পূর্ন সঠিক ফলাফল নিরুপন করা সম্ভব নয় কারন সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণায় আজ যা আবিষ্কৃত হয় ভবিষ্যতে অন্য একজন গবেষক হয়ত একই বিষয় ভিন্ন ফলাফল তৈরী করবেন। তবু আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা নারী সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কল্যাণকর কোন অবদান রাখতে পারলে পরিশ্রম যা হয়েছে সবটুকুই সার্থক হবে বলে আশা করি।

আমার গবেষণার সামগ্রিক বিষয়টি তত্ত্বাবধান করেন আমার প্রিয় শিক্ষক ড: বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর এ বিষয়ে আমার পূর্ব থেকেই মনস্থির করা ছিল এম. ফিল গবেষণা করলে আমি জনাব বোরহাউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের সংগে কাজ করবো। অবশ্য তিনি প্রথম দিকে একেবারেই রাজী ছিলেন না। তিনি বারবারই আমাকে বলেছিলেন এম:ফিলের মত একটি ডিগ্রী নিতে হলে যে অনুশীলন ও ধৈর্য প্রয়োজন তা সবার নেই এবং অধিকাংশই ভর্তি হয নামমাত্র। কিছুদিন পরে ছেড়ে চলে যায়। আমি জনাব জাহাঙ্গীরকে বলেছিলাম আমি আমার গবেষণার ব্যাপারে যত্নবান হব এবং শেষ করার চেষ্টা করবো। অত:পর তিনি রাজী হন এবং সামগ্রিক কাজটি আমি তাঁর তত্ত্বাবধানে সমাপ্ত করি।

এম. ফিল প্রথম পর্বের পরীক্ষা শেষ হয় ১৯৯৩-এর এপ্রিলে এবং ফলাফল বের হয় জুন নাগাদ। তখন থেকেই আমি সমস্যা আক্রান্ত হই কিভাবে থিসিস এর কাজটি শুরু এবং শেষ করবো। বিভিন্ন জনের সাথে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেই। প্রাথমিকভাবে নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সাহিত্যের (Literature) উপর একটি ধারণা তৈরীর পর আমি একেবারে মাঠ পর্যায় গ্রামে কাজ করবো। আমার মনে হয়েছে গ্রামে কাজ করলে গ্রামীণ নারীদের খুব কাছে থেকে দেখা, জানা ও বোঝা যাবে। তাহলে তাদের জীবনধারার চিত্র তুলে ধরা আংশিক হলেও সহজতর হবে।

আমার ফিল্ডে কাজ করার ব্যাপারে আমাকে অনবরত উৎসাহ দিয়ে সহায়তা করেছেন জনাব নাসিম-উল-গনি। যিনি আমার জীবনের সমস্ত সুখ দ:খের অংশীদার। তিনি প্রায়ই পটুয়াখালী ফোন করে আমাকে তাগিদ দিতেন ফিল্ডে কাজ নিয়মিত করার জন্য। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার শিক্ষক ড: বোরহাউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর আমাকে প্রায়শ:ই বলতেন যত দ্রুত সম্ভব ফিল্ড শেষ করে থিসিস লিখে জমা দেয়ার জন্য। থিসিস জমা দেয়ার তাগিদটি অবশ্যই আমার হওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি আমার গবেষণার কাজটি শেষ করার ব্যাপারে আমাকে উৎসাহিত করেছে। এছাড়া সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্রের সুরাইয়া ও হাসিনা আপা বই প্রবন্ধ দিয়ে এবং নারী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে আমাকে সাহায্য করেছেন। আমার ফিল্ডের কাজের ব্যাপারে আমি তাদের সাথে প্রায়ই আলোচনা করতাম। এ ব্যাপারে তারা কখনোই বিরক্ত বোধ করেননি। মেঘনা গুহ ঠাকুরতার সঙ্গেও বৈদেশিক সাহায্য, নারী বিষয়ে আলোচনা করেছি- পদ্ধতিগত বিষয়েও মেঘনাদি আমাকে সহায়তা করেছেন। আমি তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

আমি ১৯৯৩-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৯৪-এর জুন পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের কাজে রত ছিলাম। এর মধ্যে সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত তিনমাস বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের অনুসন্ধান এবং তার উপর তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলাম। দ্বিতীয় পর্যায় ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী পর্যন্ত গ্রাম বাছাই এবং সমগ্র গ্রামের উপর তথ্য সংগ্রহ করেছি। তৃতীয় পর্যায় ফেব্রুয়ারী থেকে জুলাই এর প্রথম সপ্তাহ অব্দি গবেষণার মূল অংশ অর্থাৎ গ্রামের ভূমিহীন মহিলাদের উপর তথ্য নিয়েছি। মাঠ পর্যায় কাজ করার ক্ষেত্রে আমার প্রথম দায়িত্ব ছিল একটি গ্রাম নির্বাচন করা। গ্রাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। কারণ এমন একটি গ্রাম বাছাই করতে হবে যেখানে গ্রামীণ ভূমিহীন নারীরা তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্য পাচ্ছে অর্থাৎ ঐ গ্রামে একটি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে যারা নারী উন্নয়নকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হচ্ছে। এছাড়া গ্রামে অবস্থানের সুবিধা, অর্থনৈতিক বিষয়টি নিয়েও ভাবতে হয়েছে। পটুয়াখালী আমার জন্মস্থান ও পৈত্রিক নিবাস। আমি সিদ্ধান্ত নেই পটুয়াখালীতে অবস্থানকালীন সময় একটি গ্রাম নির্বাচন করে কাজ শুরু করবো। কারন এর পূর্বে আমি 'আশা' নামক এন.জি.ও সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের সময় জেনেছিলাম পটুয়াখালীতে 'আশার' শাখা অফিস আছে এবং সেখানে বিভিন্ন থানার অধীনস্থ গ্রামগুলিতে আশা মহিলাদের নিয়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ করছে। তবে পটুয়াখালীতে যে নির্দিষ্টভাবে কাজ করবো এটি আমার পূর্বের সিদ্ধান্ত ছিল না। পটুয়াখালী কাজ করার ব্যাপারে সুবিধা ছিল পটুয়াখালীর মানুষের জীবনধারা এবং সংস্কৃতির সাথে আমি পরিচিত ছিলাম। ওখানে কোন গ্রামে কাজ করা আমার জন্য সুবিধাজনক হবে কারণ আঞ্চলিক ভাষাও আমার জানা ছিল।

পটুয়াখালীতে আশা ছাড়াও গ্রামীণ ব্যাংক, ব্রাক, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র, বি.আর.ডি.বি প্রভৃতি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করছে। তবে প্রথম পর্যায়েই আশার অফিসিয়ালদের সহযোগিতার মনোভাব আমাকে উৎসাহিত করেছে। যদিও অন্য কোন সংস্থার অফিসে আমি যাইনি এবং আলোচনা করিনি।

পটুয়াখালীতে আশার অফিস ছিল আমার বাসার খুব কাছে, তাই নিয়মিত আলাপ আলোচনা করা সহজসাধ্য ছিল। আশার পটুয়াখালী শাখা অফিস থেকে তাদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কিত কাগজপত্র সংগ্রহ করি এবং আলোচনার মাধ্যমে ফিল্ডের অবস্থানগুলো জেনে নেই।

পটুয়াখালী জিলার অধীনে ছিল তিনটি ইউনিট
১) বসাকবাজার
২) সেহাকাঠী
২) লোহালিয়া

আমি তিনটি ইউনিট অফিসেই যোগাযোগ করি এবং বসাকবাজার ইউনিটের অধীনে যেকোন একটি গ্রাম বেছে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেই। বসাক বাজার ইউনিটের দূরত্ব পটুয়াখালী থেকে ৪কিলোমিটার। ২রা ডিসেম্বর থেকে ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বসাক বাজার ইউনিটের আটটি গ্রাম ঘুরে পটুয়াখালী শহর থেকে গ্রামের দূরত্ব যোগাযোগ ব্যবস্থা অবস্থান করার মত অবস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করি। আশা'র বসাকবাজার ইউনিটের অন্তর্গত সারিকখালী, হেতালিয়া, আউলিয়াপুর, চালিতাবুনিয়া, বহালগাছিয়া, হাজী খালি , চারাবুনিয়া, বল্লভপুর, কালিকাপুর, ডেরাখালী, পক্ষিয়া, ডিবুয়াপুর এ ক'টি গ্রামের মধ্যে ডিবুয়া পুর গ্রামটিকে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেই। ডিবুয়াপুর গ্রামটি বেছে নেয়ার পেছনে কিছু কারন ছিল। সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

Dhaka University Institutional Repository

(১) 'আশা' ডিবুয়াপুর গ্রামে চারবৎসর যাবৎ মহিলাদের সংগঠিত করে বৈদেশিক সাহায্যের একটি অংশ ঋণ হিসেবে মহিলাদের কাছে পৌছাচ্ছে। আশার ঋণ কর্মসূচীর নির্দিষ্ট মেয়াদের মাত্র এক বছর বাকী, তাই মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি বিশ্লেষণ করা সহজতর হবে বলে আমার মনে হয়েছে।

(২) আশা ব্যতীত ডিবুয়াপুর গ্রামে ঋণদানকারী সংস্থা ছিল একটি গ্রামীণ ব্যাংক কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংক কেবলমাত্র পুরুষদের সংগঠিত করছে। অন্য ক্ষেত্র বলতে ছিল কেয়ার এর রাস্তা বাধাই এর কাজ এবং সেক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহন খুবই কম ছিল। আশার অধীনে ঐ গ্রামের চল্লিশজন মহিলা সংগঠিত হয়ে কতটা সাফল্য অর্জন করছে সেটি জানার অভিপ্রায় আমার ছিল।

(৩) যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল। অর্থাৎ শহর থেকে রিক্সাযোগে মূল প্রবেশপথ পর্যন্ত রিক্সাভাড়া করে যাওয়া সম্ভব।

(৪) আমার পিত্রালয় অবস্থান করে কাজ করার সুবিধা ছিল কারন আমার চার বছরের ছেলেকে মা কিংবা বোনের কাছে রেখে যেতাম।

(৫) বিভিন্ন গ্রাম সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে গিয়ে দেখেছি নিয়মিত যাতায়ত করে ফিল্ড ওয়ার্ক করা আমার পক্ষে দু:সাধ্য হয়ে উঠবে। গ্রামে অবস্থান করার চেষ্টা হয়ত করা যেত কিন্তু আমার চার বছরের ছেলে 'সৌনক' পটুয়াখালীর আবহাওয়া, পানি দুটোতেই অনভ্যস্ত বলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সুতরাং ডিবুয়াপুর কাজ করাই আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি।

এরপর আমি এক সপ্তাহের জন্য ঢাকা ফিরে আসি এবং সামগ্রিকভাবে ফিল্ডে যাওয়ার জন্য প্রশ্নপত্র তৈরী, কাজের পদ্ধতি ধরন প্রভৃতি প্রারম্ভিক বিষয়াবলীর ব্যাপারে আমার তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে বসে আলোচনা করে ঠিক করে নিয়েছিলাম। পরবর্তীতে পটুয়াখালী ফিরে যাই এবং গ্রামটির উপর প্রাথমিক জরিপের কাজ শুরু করি। ডিসেম্বরের শেষদিকে পটুয়াখালীতে শীত ভালভাবেই জেঁকে বসেছে। গ্রামের মাঠ, ঘাট ছিল শুকনো। রোদের তাপ প্রখর নয়। খুব সকালে শীতের মধ্যে কনকনে ঠান্ডায় বেশ বেগ পেতে হত। তবুও প্রকৃতি ছিল আমার অনুকূলে। আমি প্রতিদিন ভোর ছটায় নাস্তা ও পানিসহ ব্যাগ নিয়ে গ্রামে চলে যেতাম এবং ফিরতাম সন্ধ্যা ছটা নাগাদ। প্রথম দুদিন গ্রামে গিয়ে দেখি আশা ভূমিহীন সমিতির তত্ত্বাবধায়ক বসে আছেন আমাকে গ্রুপের সংগে পরিচয় করিয়ে দেবেন বলে। দুটি বাড়ীতে দুটি গ্রুপ বসতো। আমি জানিয়েছিলাম প্রথম যেহেতু সমগ্র গ্রামের উপর জরীপ করবো সেহেতু গ্রুপ এবং তার, স্থান, সময় জেনে যাব। আমাকে পুরো গ্রামের জরীপের কাজে সহায়তা করেছে আমার ছোট বোন সাফা। আমি ওকে সাধ্যমত উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট রেখেছি।

ডিবুয়াপুর গ্রামটি পটুয়াখালী শহরের নিকটবর্তী হলেও অন্য দশটি গ্রামের মতই এর বৈশিষ্ট। স্বতন্ত্র কিংবা অধিক উন্নত বলে মনে হয়নি। কাঁচা এবড়ো থেবড়ো রাস্তা। রাস্তার মাঝে মাঝেই বড় আকারের গর্ত- কোথাও তা ঢালু- হয়ে গেছে। কোন কোন রাস্তার সাথে খালের সংযোগ আছে। খাল পেরোতে বাঁশের নড়বড়ে সাঁকো বিংবা তাল বা খেজুর গাছ ব্যবহার করা হয়। রাস্তার পাশে কিংবা খালের মধ্যে কাঁচা পায়খানা রয়েছে। খালের পানিতে সাঁকো দিয়ে গ্রামের মহিলারা ধোয়া মোছার কাজ করেন। শীতের দিন বলে ধানক্ষেতের আইল ধরে এ বাড়ী ওবাড়ী যাতায়ত করা যেত। গ্রাম থেকে কোয়াটার মাইল দূরে '৯০ সালেও উপজেলা অফিস ছিল। আমি যখন প্রথম গ্রামে যাই সেসময় দেখেছি পটুয়াখালী শহর থেকে ছেলেমেয়েরা উপজেলা অফিসে (বর্তমানেও উপজেলা অফিস বলা হয়) সমবেত হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য। গ্রামের জীবনযাত্রায় এর তেমন কোন প্রভাব পড়ে বলে মনে হয়নি।

গ্রামে যেদিন প্রথম সালোয়ার কামিজ পরিহিত অবস্থায় গিয়েছি অসংখ্য লোকের কৌতুহলী চোখ আমাকে বারংবার লক্ষ্য করেছে। অনেকে ধানক্ষেত কিংবা সব্জীক্ষেত থেকে কাজ ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে পড়েছে। আবার

Dhaka University Institutional Repository

রাস্তার মধ্যে একদল লোক দাড়িয়ে গল্প করছিল তারাও জানা এবং বোঝার চেষ্টা করল আমি কে, কেন এসেছি ইত্যাদি। বিশেষত ঐ গ্রামের প্রবীণ এবং উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের কৌতুহল একটু বেশী ছিল। দু'চারজন জিজ্ঞেস করেছে আমি কোন বাড়ী যাব। যখন বলেছি পুরো গ্রামের সব বাড়ীই যাব– তখন জানতে চেয়েছে আমি পরিবার পরিকল্পনার অফিস থেকে এসেছি কিনা। কেউ কেউ ভেবেছে আমি সরকারী অফিস থেকে গিয়েছি। বেশীরভাগ মানুষেরই ধারনা সরকার গরীব মানুষদের ঋন দিচ্ছে। অনেকেই জানতে চেয়েছে বাংলাদেশে এত গ্রাম থাকা সত্বেও আমি ডিবুয়াপুরে বিশেষ কি উদ্দেশ্যে এসেছি। এছাড়া আমার পারিবারিক অবস্থা, অবস্থানগত বিবরণ বিশেষত স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী, সন্তান আছে কিনা? আছে শুনে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল তারা এভাবে একাকী অজানা অচেনা পরিবেশে কেন আসতে দিল? বিশেষত এটা যেহেতু আমার চাকুরী সংক্রান্ত কাজ নয়– সুতরাং এভাবে মাঠে ঘাটে ঘুরে কাজ করা ঠিক নয় বলে মন্তব্য করল। অনেক কৌশলে এদের প্রশ্নে উত্তর দিতে হয়েছে। মহিলারা অনেকেই বলেছে গ্রামে বেশীদিন চলাফেরা করলে আমি যেন মাথার কাপড় দিয়ে চলাচল করি। এতে মুরুব্বী স্থানীয় লোকজন অসন্তোষ প্রকাশ করবে না। তবে আমর বিয়ে হয়েছে, একটি পুত্র সন্তান আছে এগুলো ছিল আমার জন্য প্লাস পয়েন্ট। কারন আমি যখন গ্রামে কাজ করেছি তার কিছুদিন পর ব্রাকের একজন অবিবাহিত মহিলা কর্মী গল্প করেছে গ্রামে তাকে বিয়ের বিষয় নিয়ে বহু প্রশ্নের মুখোমুখী হতে হয়েছে। আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে পটুয়াখালী শহরে আমার বাড়ী, আমি ঐ এলাকার মেয়ে সুতরাং অপরিচিত হলেও মহিলারা তেমন সংকোচ বোধ করেননি। আমার স্বামী কি করেন– তার আর্থিক অবস্থা কেমন এ প্রশ্নও করেছে অনেকে। গ্রামের লোকজন খুব সহজ সাবলীলভাবে বিভিন্ন মন্তব্য করে ফেলেন। ঐ গ্রামের একজন বয়জ্যেষ্ঠ লোকের কাছ থেকে বক্র মন্তব্য অবশ্য আমাকে শুনতে হয়েছে। দোকানে কলা কিনতে গিয়ে তার সাথে দেখা। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার বাড়ী কই? কোন অফিস থেকে আইছেন" আমি সংক্ষেপে আমার পরিচয় জানালাম। আশার ভূমিহীন সমিতির মহিলাদের সাথে কথা বলব শুনে বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, "মহিলারা ঘর ছাইড়া বেপর্দা চলাফেরা করার সাহস পায় এসব সংস্থার কারণে। আমার বাড়ীর মহিলারা এসব সমিতি করলে বুঝিয়ে দিতাম। এরা গরীব। বেঈমান। যে টাকা দেয় তার সাথেই আছে। একবার ঘাড় সোজা করে দাড়াতে পারলে আপনার আমার সবার ঘাড়ে চাপবে।" ভদ্রলোকের বিরূপ মন্তব্যের জবাব দেয়ার অনীহা বোধ করলাম। কারণ এ গ্রামে আমাকে কাজ করতে হবে সুতরাং এসব মন্তব্যের জবাব না দেয়াই শ্রেয়। গ্রামে প্রায় উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাড়ীতে ভূমিহীনদের সম্পর্কে ক্ষোভ রয়েছে। কারণ ভূমিহীন শ্রেণীকে এরা পূর্বের মত স্বল্প কিংবা বিনা পারিশ্রমিকে খাটিয়ে নিতে পারে না।

ডিবুয়াপুর গ্রামে যুবক বয়সী ছেলেদের নিকট থেকে তেমন কোন মন্তব্যের সম্মুখীন হইনি। এর অন্যতম কারণ আমি পটুয়াখালী শহরের মেয়ে। গ্রামে বেশী বেগ পেতে হয়েছে জরীপ করার সময়। মহিলারা নানা কাজে ব্যস্ত। অনেক সময় মহিলারা কথা বলতে চাইলেও পুরুষরা আগ্রহী হয়ে কথা বলতে আসে। তারা নিজেদের দারিদ্র এবং সমস্যাকে বাড়িয়ে বলতে উৎসুক। এমন হয়েছে পরবর্তী কোন সময় পুরুষের অনুপস্থিতে গেলে ভিন্নতর তথ্য পাওয়া গেছে। যেমন ঐ গ্রামে কতগুলো ভূমিহীন পরিবার আছে যারা গ্রামীণ ব্যাংকের ঋন প্রকল্পের আওতাধীন কিন্তু তারা অন্য সংস্থা থেকে বাড়তি সাহায্য পাওয়ার আশায় সঠিক তথ্য দিতে চাইত না। কিন্তু মহিলারা বলে দিত। আবার কথা বলছি এ সময় পুরুষ সদস্য বাড়ী এলে মহিলারা কথা বলতে চাইত না। পরে দেখা করতে বলত। অনেক সময় বাড়ীর পুরুষ সদস্যকে যদি জিজ্ঞেস করা হত আপনার স্ত্রী কি করেন? সে উত্তর দিত কিছুই করে না। অথচ দেখা যেত স্ত্রী হয়ত গোবর দিয়ে জ্বালানি বানাচ্ছে– পুকুর থেকে পানি আনছে কিংবা ঘরবাড়ী নিকোচ্ছে। অর্থাৎ তার স্ত্রীর প্রাত্যহিক কাজকর্ম তার কাছে কর্তব্যের মধ্যে নয়। অনেক মহিলারা আবার নি:সংকোচে কথা বলতে চাইত– তবে এ প্রবণতা তৈরী করতে অনেক সময় লেগেছে। প্রতিনিয়ত যাওয়ার ফলে মহিলা এবং পুরুষ উভয়েরই শঙ্কা, দ্বিধা কেটে গিয়েছিল।

মহিলাদের মধ্যেও নিজের অভাব অভিযোগ বাড়িয়ে বলা এবং স্বচ্ছলতাটুকু চেপে যাওয়ার প্রবণতা ছিল। 'আশা'র ভূমিহীন সদস্যরা তাদের অভাব অভিযোগের কথা ভাল করে লিখতে বলেছে যাতে সরকার তাদের অনেক সাহায্য দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের পথে যাতায়াত করতে অসুবিধা হয়েছে সাঁকো পারাতে এবং এবড়ো থেবড়ো রাস্তায় খালি পায় হাটতে। প্রায়ই পায় ফোস্কা পড়ে যেত। প্রচন্ড মাথাব্যথা ও পায়ে ব্যথা আমাকে পীড়া দিয়েছে কয়েকদিন। আর একটি বিষয় গ্রামের রাস্তায় কষ্ট দিত কাঁচা পায়খানা এবং যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগের ফলে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে হাটতে হত। গ্রামের বাড়ীঘরের পরিচ্ছন্নতার অভাব প্রকট। আমাকে প্রায়ই হোগলাপাতার চাটাই কিংবা কাঠের পিঁড়িতে বসে কথা বলতে হত। কখনো পুকুর পাড়ে গাছের গুড়ির উপর বসে কথা বলতাম। একটা ব্যাপারে সবাই আমাকে (পরিচিতজনরা) সাবধান করেছিল সেটা হল কালিকাপুর ইউনিয়নের ছেলে এবং ডিবুয়াপুর যাওয়ার পথে এতিমখানার রাস্তা এবং বাধঘাটা। মাঠ পর্যায় গ্রামে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার একেবারে পুরানো নয় বলে গ্রামের এসব বিষয় নিয়ে আমাকে ততটা বেগ পেতে হয়নি। কারণ ছাত্রজীবনে বাজার জরীপের কাজে রাজশাহীর গোদাগাড়ীর মত প্রত্যন্ত গ্রামে আমি এগার মাইল রাস্তা পায়ে হেটে কাজ করছি। পটুয়াখালীতেও করেছি। এবার কাজ করার সময় আমার বাবা, মা খুব টেনশন বোধ করতেন কারণ আমি খুব সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরতাম। তবে তাদের আশংকা মিথ্যে করে দিয়ে কোন দুর্ঘটনা ছাড়াই আমি কাজ করেছি।

আমার পৈত্রিক নিবাস পটুয়াখালী এবং আঞ্চলিক ভাষা জানার ফলে আমার আশার মহিলাদের কাছাকাছি যেতে সুবিধা হয়েছে। নিয়মিত যেতে যেতে ওদের সবার সংগে সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। জানিনা বর্তমানে তারা আমাকে কতটা মনে রেখেছে। একজন মহিলা গবেষক হিসেরে গ্রামে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখী হয়েছিলাম বিশেষত গ্রামের পুরুষ মহিলা উভয়ের কাছেই একটি অবিবাহিত মেয়ে ঘুরে কাজ করাটা যেমন সমালোচনার বিষয় তেমনি বিবাহিত মেয়ে স্বামী সন্তান, ঘর-সংসার রেখে গ্রামে কাজ করবে এটাও ওদের নিকট পছন্দসই নয়। তাই ধনী, গরীব নির্বিশষে সবার বাড়ীতে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু ভূমিহীন শ্রেনীর যারা বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে জড়িত তাদের নিকট এ বিষয়গুলো সমস্যার উদ্রেক করে নি। তবে কোন পুরুষ সদস্য ছাড়া একাকী ঘুরে কাজ করাকে কেউই নিরাপদ মনে করেনি। এটা একটি সামাজিক কারণ গ্রামে কোন মেয়ে একাকী চলাফেরা করাটা গ্রামের পুরুষ, মহিলা কেউই ভাল চোখে দেখে না।

তবুও শেষ পর্যন্ত নিরাপদে আমার মাঠ পর্যায় গবেষণার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভাল লেগেছে বহুদিন পর গ্রামের এ প্রান্ত ও প্রান্ত ঘুরে বেড়াতে। নির্জন ঠান্ডা পরিবেশ। এখানে ওখানে খাল, বিল, ঝিল, কেয়া ফুলের গন্ধ, বাঁশ ঝাড়ের শো শো শব্দ, স্বর্ণলতা গাছের অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে শৈশবে নানাবাড়ী বেড়ানোর স্মৃতি ভেসে উঠেছে। বহুদিন পর গ্রামীণ জীবনধারার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের ফলে অনেক মৌলিক তথ্য জানার সুযোগ হয়েছে। খারাপ লেগেছে গ্রামীণ জীবনধারার সঙ্গে নগর জীবনের ব্যাপক পার্থক্য দেখে। আরও খারাপ লাগত গ্রামের জনগোষ্ঠীর জানা ও বোঝার পরিধি দেখে। শহরে যেকোন লোকই ওদের কাছে বিদেশী সাহেব কিংবা বিদেশী মহিলা। 'বিদেশী' শব্দটি বুঝাতে অনেকেই বলেছেন আপনার মত বিদেশী আপারা এসেছেন। কথা বলেছেন। অথচ আমরা একই রাষ্ট্রের নাগরিক। ধোপদুরস্ত কাপড় চোপড়, জুতা পড়া লোক মাত্রেই ওদের কাছে বিদেশী।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা ঃ ভূমিহীন মহিলাদের উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশলের একটি অংশ। এদেশের অনুন্নত জনগোষ্ঠী স্বল্পতম সময় ন্যূনতম উন্নয়ন অর্জন করতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। মূলত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অশেষ উন্নতির ফলে অনুন্নত বিশ্ব জানে উন্নত বিশ্বের উন্নয়ন ও অগ্রগতির তথ্য। বর্তমান শতাব্দীতে উন্নয়ন মানে পরিবর্তনশীলতা, গতিশীলতা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উন্নততর অবস্থা অর্জনের প্রক্রিয়া।২ কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে শুরু করে তার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর মধ্যে নারী উন্নয়ন এবং নারীমুক্তির প্রশ্নে দীর্ঘদিন যাবৎ একটি অসম্পূর্ণ বোধ নিয়ে কাজ করেছে। সরকারী কিংবা বিরোধী রাজনৈতিক দল (এমনকি বামদলও) কিংবা সামাজিক সংগঠনগুলোও নারী সংক্রান্ত বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে সমর্থ হননি। অন্যদিকে আমরা জানি বাংলাদেশ বৈশ্বিক পুঁজিবাদী বলয়ে অবস্থিত একটি দেশ এবং অন্যান্য অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর মতই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ফলে এর যেকোন উন্নয়ন প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হবে এটাই স্বাভাবিক অর্থাৎ বাংলাদেশের উন্নয়নকৌশল, পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বহুলাংশে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক শক্তি এবং তাদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। সঙ্গত কারনে বলা যায় বৈশ্বিক নারী উন্নয়নের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে বাংলাদেশের নারী উন্নয়নের বিষয়টিও সম্পর্কায়িত। অর্থাৎ সত্তর দশকের উন্নয়ন স্ট্রাটেজী (মানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ) ঐ সময়কালেই (Ester Boserupএর Women's role in economic development) বইয়ের প্রকাশ, ৭৫-এর জাতিসংঘ নারী দশক ঘোষণা এবং পাশ্চাত্যের নারীবাদী আন্দোলন একই ধারায় প্রবাহিত হয়। ফলে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর নারী উন্নয়ন প্রক্রিয়া, চিন্তা, রনকৌশল তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে সরাসরি প্রভাবিত করে। কারণ বাংলাদেশ অতিমাত্রায় সাহায্য নির্ভর একটি দেশ; অন্যদিকে এর গ্রামাঞ্চলে রয়েছে বিশাল ক্ষুদ্র কৃষক ভূমিহীন ও নারী সমাজ।৩ "বর্তমান বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান প্রান্তিক। এ প্রান্তিকতা সমাজব্যবস্থার স্তরবিন্যস্ত কাঠামো থেকে তৈরী হয়েছে। অপরপক্ষে এ প্রান্তিকতার দুটো উপাদান অধঃস্তন এবং নির্যাতন স্তরবিন্যস্ত কাঠামোজনিত কারণেই শক্তিশালী হয়েছে। অধঃস্তনতা ও নির্যাতন পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে শোষণের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে তোলে। তার দরুণ পুরুষ নারীর শ্রম লুণ্ঠন করে কিংবা নারীদের শ্রমের উপর আরাম করে। এই শ্রম লুণ্ঠন করা, এই আরাম করা শোষণ। সেজন্য নারীরা তিন অর্থে শোষিতঃ

১. তারা মানুষ হিসেবে শোষিত

২. তারা গৃহবধু হিসেবে পুঁজি কর্তৃক শোষিত

৩. তারা বেতনভুক্ত মজুর হিসেবে শোষিত।"৪

মূলতঃ নারীর উপর শোষণ এবং তার অধঃস্তনতার মূল ক্ষেত্র আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। পিতৃতান্ত্রিক ধ্যানধারণা এবং মূল্যবোধে উৎসারিত পরিবার ব্যবস্থায় মাতৃত্বকে দাঁড় করানো হয় চমৎকার রূপকথার আদলে যা এই পুরুষতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে। আবার প্রাত্যহিক গৃহস্থালীর একঘেঁয়ে অর্থমূল্যবিহীন কাজ দিয়ে নারীকে পরাধীন করে রাখা হয় যদিওবা পরিবারের বাইরে বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে অর্থকরী কাজে নারী নিয়োজিত হয় সেখানেও লিঙ্গীয় শোষনের ফলে সে তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়। বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের পাশাপাশি নারীবাদীদের পিতৃতন্ত্র, লিঙ্গচিহ্ন, শোষণ এবং মাতৃত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা নারীর অনুন্নয়নের সমস্যাগুলোকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণে সমর্থ হয়েছে। কারন নারী সংক্রান্ত বিষয় মার্কসবাদ যথেষ্ট বাস্তবসম্মত আলোচনা করলেও নারী সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় যায়নি। শ্রেণীর উপর

জোর দিতে গিয়ে মার্কসবাদ অন্যান্য বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করেছে। নারীবাদীরা নারীর সমস্যাগুলোকে ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি ও রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে চেয়েছিলেন। তাদের মতে যেহেতু পুরুষতন্ত্র এবং অন্যান্য অনুগামী প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্র ছাড়া স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারে না। তাই এগুলোর বিরুদ্ধে যেকোন দ্বন্দ্ব রাষ্ট্র বিরোধিতারই শামিল।

আমি বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন প্রক্রিয়াও কর্মসূচীর মধ্যে এ সমস্ত বিষয়গুলো বোঝার এবং উপলব্ধির চেষ্টা করবো। কারন বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে নারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি পাশ্চাত্যের নারীবাদী আন্দোলনের জোয়ারও বাংলাদেশকে প্রভাবিত করেছে। মূলত: বাংলাদেশে '৭৫ পরবর্তী জিয়াউর রহমানের শাসনামল থেকে নারী উন্নয়নের বিষয়টি রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ পরিকল্পনাও কর্মসূচীতে স্থান করে নেয। কারণ এ সময় থেকেই বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। "১৯৭৭ সালে অনুমান করা হয় উন্নয়ন কাজের জন্য সর্বমোট ৭৫-৮০ ভাগ এসেছে বৈদেশিক সাহায্য থেকে"[৫] অপর এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৭১ সন থেকে '৮৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ১৫,৪১৯ মিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক সাহায্য পায়।"[৬] বর্তমান পরিসংখ্যানে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে ১৯৯০-৯৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের অনুদান ও ঋণের পরিমান নিম্নে সারনী আকারে দেয়া হল-

সারণী-১

বৎসর	অনুদান	ঋণ	মোট
১৯৯০-৯১	৮৩১.৪	৯০১.১	১৭৩২.৫
	(৪৮.০)	(৫২.০)	(১০০.০০)
১৯৯১-৯২	৮১৭.৩	৭৯৪.১	১৬১০.৪
	(৫০.৩)	(৪৯.৩)	(১০০.০)
১৯৯২-৯৩	৭৪৭.৮	১০০৮.৪	১৭৫৬.২
	(৪২.৬)	(৫৭.৪)	(১০০.০)

* উৎস ঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

এভাবে বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহের সাথে দাতা দেশ ও সংস্থাগুলো প্রকল্পভিত্তিক উন্নয়নের উপর জোর দেয়। ফলশ্রুতিতে দেখা যায় ১৯৭১-৯৩ পর্যন্ত, সময় খাদ্য ও পন্য সাহায্যের পরিমাণের চেয়ে প্রকল্প সাহায্যের পরিমান বৃদ্ধি পায়। নিম্নে সারণীর মাধ্যমে তা দেয়া হল-

সারণী-২

সাহায্যের প্রকারভেদ	১৯৭১-৯৩	শতকরা হার
খাদ্য সাহায্য (ভোগ)	৫১২০.০	১৯.৮২
প্রকল্প সাহায্য (বিনিয়োগ)	১২২৭৮.৫	৪৭.৫৩
পণ্য সাহায্য (বিবিধ ব্যবহার)	৮৪২৯.২	৩২.৬৩

* উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ৯২-৯৩

এ প্রেক্ষিতে দেখা যায় নারী উন্নয়ন খাতেও বৈদেশিক সাহায্য এসেছে প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রমে জন্য এবং তা বাস্তবায়িত হয়েছে সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায়। এরা মানব সম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি আয়বৃদ্ধি প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের দারিদ্র দূরীকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রকল্পভিত্তিক কর্মসূচী

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্পভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহন করে। দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচীর মধ্যে গ্রামীণ ভূমিহীন মহিলাদের চিহ্নিত করা হয় সবচেয়ে অধিকার বিহীন, নির্যাতিত ও বঞ্চিত শ্রেণী হিসেবে। এক্ষেত্রে বেসরকারী পর্যায় এন.জি.ও গুলোর ভূমিকা ব্যাপক। এদের কাগজপত্রাদিতেও নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন তথ্যাদি রয়েছে তারা দাবী করছে মহিলারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের সনাতন ও পশ্চাৎপদ ভূমিকা থেকে বেরিয়ে আসছে। বর্তমানে দাতা দেশ ও সংস্থাগুলোও গ্রামীণ জনগণের দারিদ্র দূরীকরণের ক্ষেত্রে এন.জি.ও-র মাধ্যমে সাহায্য করতে অধিকতর আগ্রহী। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের উদাসীনতা, রাজনৈতিক দলগুলোর গ্রামাঞ্চলভিত্তিক কর্মসূচী ও পরিকল্পনার উপরে অনীহা গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে শূণ্যতা সৃষ্টি করে সে স্থানটি দখল করে নিয়েছে এনজিও গুলো। তদুপরি নারী সংগঠনগুলোর কার্যক্রম শহরভিত্তিক হওয়াতে সঙ্গত কারণে গ্রামীণ নারী উন্নয়নের বিষয়টি আজ এনজিও নির্ভর।

কিন্তু বিভিন্ন গবেষণাপ্রাপ্ত ফলাফল, পত্রপত্রিকা, প্রবন্ধ এবং গ্রন্থাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে দেখা যাচ্ছে বৈদেশিক সাহায্য ভিত্তিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া নারীর পরিবারে কিছুটা ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটালেও তাদের অর্থনেতিক উন্নয়নের বিষয়টি বর্তমানেও পশ্চাৎপদ। কারণ দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর অন্তর্গত এ নারী উন্নয়ন প্রক্রিয়া গ্রামের ভূমিহীন পরিবারগুলোকে স্থায়ীভাবে দারিদ্রের হাত থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হচ্ছে না। মূলত: বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের মাধ্যমে এনজিও গুলো নারী উন্নয়নের যে সাধারন ধারণা তৈরী করেছে এ বিষয়টি যথেষ্ট বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণার দাবী রাখে। সঙ্গত কারণে নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।

তাত্ত্বিক কাঠামো ঃ

ইতিমধ্যে নারী বিষয়ক বহু প্রবন্ধ, গ্রন্থ ও গবেষণা কর্ম প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হল-

১. বাংলাদেশের উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য ও নারী সমাজ-মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, সমাজ নিরীক্ষণ/২২ নভেম্বর ১৯৮৬ (বিশেষ নারী সংখ্যা)
২. অধঃস্তনতা ও সংগ্রাম : বাংলাদেশের নারী : নায়লা কবির- বাংলাদেশের নারী ও অন্যান্য প্রবন্ধ-হাসিনা আহমেদ অনুদিত : অক্টোবর ১৯৮৯, প্রকাশক : পরিচালক সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।
৩. Women, Work and Values - Jarina Rahman Khan, 1st Published 1992 : Center for Social Studies, Arts Building, Dhaka University.
৪. প্রসঙ্গ : উন্নয়ন ও পরিকল্পনা : ডঃ সেলিম জাহান : প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৮৯, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১১০৭, কলাভবন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৫. মহিলা/কাজ ও এনজিও এক বাস্তব চিত্র : *তাহেরা ইয়াসমীন*। প্রকাশক C.D.L. November 1993

"বাংলাদেশের উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য ও নারী সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধে মেঘনা গুহ ঠাকুরতা বৈদেশিক সাহায্যের উপর বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নির্ভরশীলতার ব্যপ্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কি প্রক্রিয়ায় কোন খাতে এ সাহায্যগুলো প্রেরিত হয়। এক্ষেত্রে তিনটি খাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে খাদ্য দ্রব্য সাহায্য, পণ্যদ্রব্য সাহায্য ও প্রকল্প সাহায্য। আর বৈদেশিক সাহায্যের কথা বলতে গিয়ে বৈশ্বিক পরিসরে এর রাজনৈতিক কৌশলগত দিকটিও তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয়ত: আন্তর্জাতিক পরিসরে নারী উন্নয়ন চিন্তা কিভাবে বৈদেশিক সাহায্যের সংগে সংশ্লিষ্ট হয়েছে তার তাত্ত্বিক দিক এবং বাংলাদেশ সাহায্য প্রাপ্তির উৎস হিসেবে নারী উন্নয়ন কৌশলকে '৭৫ পরবর্তী সরকার (জিয়াউর রহমানের সময়কালে) থেকে কতটা সফলভাবে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ, কর্মসূচী ও পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করেন। আবার সাহায্য গ্রহীতা দেশ হিসেবে বাংলাদেশের দ্বৈত

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্র অর্থাৎ সরকার একদিকে পাশ্চাত্য থেকে প্রাপ্ত সাহায্য এবং চিন্তাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন আবার মধ্যপ্রাচ্যের মত ইসলামী দেশগুলোর সাহায্যের জন্য ইসলামী বিধি-বিধাণ অনুযায়ী নারীদের অন্তরিত থাকার কথা বলছেন।

তৃতীয়ত: মেঘনা গুহ ঠাকুরতা বাংলাদেশে মহিলাদের কিভাবে, কোন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচীর সাথে সংযুক্ত করা হচ্ছে সে বিষয়টির উপর আলোচনা করেন। এক্ষেত্রে প্রথম ধারায় আছে জন্মনিয়ন্ত্রন প্রকল্প দ্বিতীয় ধারায় নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচীকে তিনি চিহ্নিত করেছেন দারিদ্র দূরীকরন নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত বলে । তৃতীয় ধারায় রয়েছে সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টি।

চতুর্থত: তিনি বলেছেন এ সব প্রক্রিয়ার মধ্যে নারীর উন্নয়নের ইতিবাচক দিক সামান্য। বিশেষত অর্থনেতিক উন্নয়ন কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত হয়েও একজন নারী সম্পূর্নভাবে তার ফলাফল ভোগ করতে পারেন না। তার প্রবন্ধের এগার পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, "অর্থনেতিকভাবে উন্নত হলেও রক্ষণশীল সামাজিক মূল্যবোধগুলো অনেকাংশে অপরিবর্তিত থেকে যাচ্ছে এবং সেগুলি নারীদেরকে আরও কঠিনভাবে আঘাত করছে"।

সর্বশেষে তিনি নারী উন্নয়নের তৃতীয় ধারা অর্থাৎ সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টির উপর সামান্য আলোকপাত করেন।

মেঘনা গুহ ঠাকুরতা তাঁর প্রবন্ধে মূলত: বৈদেশিক সাহায্য এবং নারী উন্নয়নের সংশ্লিষ্টতা ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু মহিলাদের উন্নয়নে সরকারী ও বেসরকারী কর্মসূচীর আংশিক চিত্র পাই যা কেবলমাত্র একটি প্রাথমিক ধারণা তৈরীতে সাহায্য করতে পারে। অন্যদিকে মহিলারা উনয়ন কর্মসূচীর সংগে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে তাদের জীবনধারার কতটা পরিবর্তন সূচীত হয়েছে কিংবা বৈদেশিক সাহায্য প্রকৃতপক্ষে কি ধরনের উন্নয়নে সহায়তা করছে, এ সাহায্যের কতটুকু অংশ তাদের কাছে পৌঁছেছে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তার লেখায় অনুপস্থিত। ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটো দিকই সংক্ষেপে উলেখ করে গেছেন। যেমন ইতিবাচক দিকের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন- "অনেকের মত অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করাতে নারীরা তাদের সনাতনী ভূমিকার বাইরে আসতে পেরেছে। এতে তারা যেন তাদের পশ্চাদপদতার থেকে এক ধাপ এগিয়ে আছে।" এ মন্তব্যটি সাধারনভাবে করা হলেও প্রশ্ন থেকে যায় কি তাদের সনাতনী ভূমিকা এবং কিভাবে, কোন প্রক্রিয়ায় তারা তাদের পশ্চাৎপদতা থেকে একধাপ এগিয়ে আছে। আবার নেতিবাচক দিক বলতে গিয়ে বলেছেন রক্ষণশীল সামাজিক মূল্যবোধ এবং নারীর জীবনে তার প্রভাবের কথা। এখানেও অনুপস্থিত রয়েছে ব্যাপক কোন বিশ্লেষণ। সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ও তিনি বিস্তারিত আলোকপাত করেননি। কিন্তু নারীর আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার ফিরে পেতে হলে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রসংগটি অত্যন্ত জরুরী এবং এ বিষয়টি উন্নয়নের আবশ্যিক অংশ। গুহ ঠাকুরতা তার প্রবন্ধে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে সামগ্রিক একটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে নারী উন্নয়ন এবং নারীর জীবনধারার পরিবর্তনকে বুঝতে হলে আরও বিস্তৃত পরিসরে ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ এবং গভীর অনুসন্ধান প্রয়োজন।

২. নায়লা কবির "অধ:স্তনতা এবং সংগ্রাম ঃ বাংলাদেশের নারী" প্রবন্ধে নারীর অবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে সংক্ষেপে নৃতাত্ত্বিক এবং পরবর্তীতে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে সমগ্র বিষয়টির অবতারনা করেন। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীও ব্যবস্থাদির উপর গুরুত্বরোপ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানী আভ্যন্তরীন উপনৈবেশিক আমল '৭০ দশকের পরিবর্তিত শাসনামল থেকে শুরু করে), স্বাধীনতাউত্তরকাল এবং পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যন্ত নারীর অবস্থান কোন পর্যায় তা তার আলোচনায় স্থান পেয়েছে। নারীর অধ:স্তন অবস্থা এবং তার পরিবর্তন আলোচনায় রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাও কর্মসূচীর প্রসংগ অত্যন্ত আবশ্যিক তাই তার লেখার প্রতিটি পর্যায় রাষ্ট্রের ভূমিকা ও সামাজিক পরিস্থিতির উল্লেখ রয়েছে। নারী বিষয় রাষ্ট্রের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়েই তিনি অতীত, বর্তমান দুটো ক্ষেত্রেই প্রাসংগিকভাবে বৈদেশিক সাহায্য সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং তার মধ্যে নারীর

Dhaka University Institutional Repository

অন্তর্ভূক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে নারী নির্যাতনের কাঠামোসমূহ বিশ্লেষিত হয়েছে দ্বিতীয় অংশে। শেষাংশে বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়নের মধ্যে অন্তরিত করার মাধ্যমে তাদের জীবনধারার পরিবর্তনের জন্য যে সব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

নায়লা কবির তার প্রবন্ধের প্রথমেই লিখেছেন, "উত্তর আফ্রিকা হতে মধ্যপ্রাচ্য ভেদ করে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাংশ পর্যন্ত ক্লাসিক পিতৃতন্ত্রের যে বিস্তৃতি বাংলাদেশ সে অঞ্চলেরই অন্তর্গত। তিনি আরও বলেছেন, "বাংলাদেশের নারীর অধঃস্তন তা বিশ্লেষণে তাই শুধুমাত্র ইসলামের আদর্শ ও আচার আচরনের উল্লেখ যথেষ্ট নয়। অধঃস্তনতার অনেক কাঠামোই যে ইসলামের আগে থেকেই বিদ্যমান এবং হিন্দু উত্তর ভারতেও দেখা যায় তা এটাই ইংগিত করে যে এ বিষয়সমূহকে বিশ্লেষণে আনতে হবে।" তিনি পাকিস্তান পর্বের বৈষম্যমুলক নীতি এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে স্থবিরতা, এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতাকে তুলে ধরেছেন। পাকিস্তান শাসনামলে নারীরা জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে সংযুক্ত হতে পারেনি। তিনি দেখিয়েছেন তৃতীয় বিশ্বের নারীরা এতই অধঃস্তন যে তারা উন্নত দেশগুলোর জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর পরীক্ষা নিয়রীক্ষার বিষয় পরিণত হয়।

দ্বিতীয় অংশে নায়লা কবির নারী নির্যাতনী কাঠামোসমূহ বিশ্লেষণ করেন। তিনি দেখিয়েছেন নারীরা তাদের স্বীয় অবস্থান থেকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকে ধাবিত হতে পারছে না। এক্ষেত্রে তিনি লিঙ্গীয় সামাজিক সম্পর্ক, পরিবার, জাতিসম্পর্ক এবং বিবাহ, পর্দা এবং লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন, পারিবারিক ভোগে অসমতা, লিঙ্গ, শ্রেণী, ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করেন। পর্দা এবং লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "নারীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রশ্নটি ছাড়াও প্রচলিত লিঙ্গীয় সম্পর্ক, তাদের অর্থনেতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক ক্ষমতাকে সংগায়িত ও সীমিত করে। অর্থনীতির ভাষায় পর্দার মধ্যেমে সৃষ্ট পুরুষ এবং নারীর ক্ষেত্রের ব্যবধান এক ধরণের শ্রম বিভাজনকে বুঝায় যা নারীদের কাজ কর্মের বৈধ ক্ষেত্রকে পরিবারের চার দেয়ালের মধ্যে গন্ডীবদ্ধ করে, পরিবারের অভ্যন্তরে তাদের দ্বারা সম্পাদিত কাজকর্মের কোন মূল্য প্রদান করে না। এবং মূলধারার কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রবেশকে নিষিদ্ধ করে।"

বাংলাদেশে স্বাধীনতা উত্তরকালে লিঙ্গীয় সামাজিক সম্পর্ক, পরিবার, জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং বিবাহ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন "স্বাধীনতা উত্তর যুগের অনেক কিছুর মধ্যে একটি বিষয় হল নারীদের বিশেষ করে নারী জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ গঠনকারী গ্রাম্য নারীদের অবস্থা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমানভাবে ধারনা লাভ করা। গ্রামভিত্তিক উন্নয়ন সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক নারী দশকের বহুল পরিমান গবেষণা কর্মের ফলেই মূলতঃ এ নূতন সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।" এ প্রসংগে আরও লিখেছেন "সযত্নে লালিত ও প্রদর্শিত বাঙ্গালী নারী, কন্যা, বধু, মাতার আদর্শ চিত্র বদলে যাচ্ছে। তদস্থলে এ মর্মে বিকাশমান সচেতনতা তৈরী হচ্ছে যে, প্রবল পদসোপানমূলক লিঙ্গীয় সম্পর্কের ভেতর বাংলাদেশের নারীগণ রয়েছেন অধঃস্তন।"

শেষাংশে সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীদের সনাতন কর্মপ্রক্রিয়া থেকে বিচ্যুত হয়ে নতুন শ্রমের ক্ষেত্রের সংগে পরিচিতি লাভ, বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে নারী উন্নয়ন চিন্তার প্রতিফলন এবং বাংলাদেশের মত সাহায্য নির্ভর দেশে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে নারীদের সংযুক্ত করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। এ পরিসরে লেখক রাষ্ট্রের ভূমিকা, রাষ্ট্রীয় নীতির সংকোচনবাদ, বেসরকারী সংস্থার ভূমিকা, রাজনৈতিক সংগঠনের ভূমিকা, বামপন্থী দলগুলোর বিভিন্ন মহিলা শাখার কর্মসূচী উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করেন। রাষ্ট্রের ভূমিকায় তিনি দেখান মুজিব শাসনামল নারী ইস্যুকে বিবেচনা করার সুযোগ পাননি। কারণ তারা যুদ্ধোত্তর ক্ষতিপূরণ, ক্রমাবনতিশীল আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি এবং '৭৪ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু '৭৫ পরবর্তী জিয়া সরকার নারী এবং উন্নয়ন লবি খোলাখুলিভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগাতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে (উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রচার তিন দশক পর) প্রথম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে নারীদের একত্রীকরণের

কৌশলের প্রতি সুস্পষ্ট সমর্থন দেয়া হয়। নারী উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত সাহায্য নিয়ে রাষ্ট্রীয় রাজনীতির বিষয়টিকে তিনি রাষ্ট্রীয় নীতির সংকোচনবাদের মধ্যে পরিস্ফুটিত করেন। পরবর্তীতে বেসরকারী সংস্থার ভূমিকা ব্যতীত অন্য অংশে নারীর রাজনৈতিক অবস্থানকে ব্যাখ্যা করেন। নারীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সংগে সংযুক্তির বিষয়টি বেসরকারী সংস্থার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আলোচনা করেন।

বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত হতে হলে নায়লা কবিরের উল্লেখিত প্রবন্ধ তথ্য এবং বিষয়সমূহ গবেষকদের যথেষ্ট সহায়তা করবে। বিশেষত তার বিশ্লেষিত কাঠামোসমূহ নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমাদের সমাজে মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সামাজিক মূল্যবোধগুলো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে– যার ফলে তাদের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়। এ অংশের সঙ্গে আমি একমত। শেষাংশে '৭০ দশকের নারী উন্নয়ন চিন্তাও বৈদেশিক সাহায্য কেন্দ্রিক আলোচনায় তিনি মূলত: রাষ্ট্রের চরিত্রের সংগে সংযুক্ত করে ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্র কেন 'নারী' খাতে সাহায্য পেল এবং রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক কৌশল এ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে কিভাবে ব্যবহার করছে ইত্যাদি তার আলোচনায় স্থান পায়। এ জিনিষটি স্পষ্ট যে রাষ্ট্র নারীর অবস্থানকে উন্নয়নের ব্যাপারে ততটা আগ্রহী নয় যতটা এ বিষয়কে ভিত্তি করে সাহায্য লাভে প্রত্যাশী। বেসরকারী সংস্থার ভূমিকার মধ্যে নারীর অর্থনৈতিক কর্মে যুক্ততার বিষয়টি আলোচিত হলেও তার পরিসর গভীরতা এবং ব্যাপ্তি সংক্ষিপ্ত বলে নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। মূলত: বাংলাদেশে '৭০ দশক থেকে যে উন্নয়ন কর্মকান্ড চলছে এবং গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করেছে, সেটা যেহেতু বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমেই হচ্ছে সুতরাং তার ফলাফল প্রভাব বিশ্লেষণ কোন সাধারণ মতামত দ্বারা পরীক্ষা বা যাচাই করা সম্ভব নয়। সাহায্য ভিত্তিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া গ্রামীণ নারীকে কিভাবে জাগ্রত করছে– সে তার অধিকার কতটুকু পাচ্ছে সনাতন কর্মপ্রক্রিয়া ছেড়ে নতুন করে অর্থনৈতিক কর্মে' সংযুক্ত হচ্ছে কিনা বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা আবশ্যক। এ সব বিষয় নায়লা কবিরের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় স্বল্প। যদিও নারীর রাজনৈতিক অবস্থান প্রতিনিধিত্বের নিম্নমান আমাদের সামজে 'নারী' সম্পর্কিত বোধ কোন পর্যায় আছে তা প্রমান করে।

৩. Women, Work and Values গ্রন্থে জারিনা রহমান খান বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীর উন্নয়নের বিষয়টি মাঠ পর্যায় গবেষণার মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি নির্দিষ্ট গ্রাম হিসেবে নিয়েছেন মানিকগঞ্জের বিরানগাও গ্রামটিকে। প্রথমত: গবেষক বিরানগাও গ্রামের অর্থনীতিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব, গ্রামীন মহিলাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংগঠনের অংশগ্রহনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন গ্রামীন নারীরা উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে বর্তমান সময়ও প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণ করতে পারছেন না। এ সমস্ত ক্ষেত্রগুলোতে রয়েছে পুরুষ প্রাধান্য। গ্রামীণ নারীদের অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে আছে সামাজিক রীতি নীতি ও মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় বিষয়াদি।

পরবর্তী অংশে (ষষ্ঠ অধ্যায়ে) বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রকল্পভিত্তিক নারী উন্নয়ন কর্মসূচী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। (আমরা জানি উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বৈদেশিক্ সাহায্য সংশ্লিষ্ট) এ পর্যায়ে তিনি বিরানগাঁও গ্রামে যে সমস্ত প্রকল্প চলছে এবং মহিলারা যুক্ত আছেন সেগুলো উল্লেখ করেন। এর মধ্যে আছে আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা দেয় প্রকল্প (কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী) বেসরকারী প্রকল্প (ব্রাক সমায় সমিতি), সরকারী প্রকল্প এবং নারী ইত্যাদি উল্লেখ্য। Food for work programme সম্পর্কে তিনি লিখেছেন এ প্রোগ্রামে কর্মরত অধিকাংশ মহিলারা বিধবা অথবা স্বামী পরিত্যক্ত এবং তাদের সাথে ছোট বাচ্চা আছে। খুব কম বিবাহিত মহিলাদের এখানে দেখা গেছে। এ প্রকল্পে কর্মরত মহিলারা অত্যন্ত দরিদ্র। এটাও দেখা গেছে বিরানগাও গ্যামে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার পরিবার কিন্তু খুব দরিদ্র তারা এসমস্ত কাজকে মর্যাদাহানিকর বলে মনে করে। এছাড়াও তারা সামাজিক মূল্যবোধের কারণে ঐ দরিদ্র শ্রেণীর পর্যায়যুক্ত হতে পারে না।

ব্রাকের কর্মসূচী পর্যালোচনা করতে গিয়ে জারিনা রহমান খান দেখান ব্রাক গ্রুপভিত্তিক সচেতনতা শিক্ষা এবং ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করলেও মহিলারা (পুরুষদের গ্রুপ আছে) ঋণ পাওয়ার জন্যই নামমাত্র শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নেয়। মহিলারা ঋণ নিলেও ঋনের ব্যবহার হয় পুরুষদের মাধ্যমে- কারণ যেকোন সামগ্রী বাজারজাত করার জন্য পুরুষ সদস্যদের উপর নির্ভর করতে হয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে ব্রাকের কর্মসূচী মহিলাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকার পরিবর্তনে সফল হচ্ছে না।

সর্বশেষে তিনি লিখেছেন তার গবেষণার মূল প্রশ্ন ছিল বর্তমান পরিবর্তিত গ্রামীণ জীবনে নারীর ভূমিকা কি এবং কিভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন তা প্রভাবিত করছে। তিনি নারীদের অবস্থা প্রসংগে লিখেছেন আশির দশকের শুরুতে নারীদের যেমন দেখেছেন বর্তমানেও তেমনই আছে। লিঙ্গীয় শ্রম বিভাজন, সামাজিক মর্যাদা, ক্ষমতা, পুরুষদের উপর নির্ভরশীলতা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে নারীরা অগ্রগামী হতে পারছে না। জেরিনা রহমান খান তার গবেষণায় গ্রামীণ গরীবদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধ সমূহকে প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তার এ সমস্ত বিশ্লেষণের সংগে আমি ঐক্যমত পোষণ করি কিন্তু পাশাপাশি এটাও বলতে চাই সূক্ষ্মভাবে দেখলে সাহায্য ভিত্তিক উন্নয়নের যে প্রবাহ (উন্নয়নের অন্যান্য সেক্টরে যেহেতু পরনির্ভরশীলতাও অনুন্নয়নকে ইংগিত করে) সেটি গ্রামীন নারীদের জীবনে কোন ধরনের পরিবর্তন আনছে- সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সাহায্য তৎপরতা সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী সেটা জানা আবশ্যক। এটা তার গবেষণায় অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে মাঠ পর্যায় সামাজিক মূল্যবোধ নিয়ে তাদের পদক্ষেপ ও ভাবনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ আবশ্যক।

৪। প্রসঙ্গ: উন্নয়ন ও পরিকল্পনা- সেলিম জাহানের বৈদেশিক সাহায্যকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের উন্নয়নের উপর লিখিত একটি গ্রন্থ এতে তিনি প্রথমত: উন্নয়নের সংগা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তিনি দেখিয়েছেন বৈশ্বিক পরিসরে যখন যে তত্ত্বকে উন্নয়ন বলে মনে করা হয়েছে তাই-ই দরিদ্র দেশগুলোতে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পঞ্চাশের দশক থেকে এ দশকের শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন তিনি লিখেছেন বর্তমান সময় উন্নয়ন মানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ" এরপরে তিনি পঞ্চাশের দশক থেকে গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবতার মধ্যেকার বিভ্রান্তি ও দূরত্বকে বিশ্লেষণ করেন। এ অংশে তিনি লিখেছেন "সত্তর দশকে এসে দেখা গেল যে গ্রামীণ উন্নয়নের নামে প্রচুর সম্পদ ব্যয়িত হলেও অনুন্নত বিশ্বে দারিদ্র ও ক্ষুধার আপাতন অনপেক্ষ ও আপেক্ষিকভাবে প্রচন্ড বেড়ে গেছে। সুতরাং আশির দশকে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল দারিদ্র দূরীকরণ এবং মানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ।" তার গ্রন্থ থেকে আমরা পাই বেশীরভাগ অনুন্নত দেশে "দারিদ্র দূরীকরণ" মানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা নিশ্চিতকরন" ইত্যাদি কথাগুলো শ্লোগান সর্বস্ব হয়ে আছে এবং এ ব্যাপারে সত্যিকারের প্রাসঙ্গিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে না। এ অংশের শেষাংশে তিনি লিখেছেন যে শ্রেণীটি রাষ্ট্র ক্ষমতায় নিয়োজিত তারা তাদের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষাও তার বিস্তৃতির লক্ষ্যেই উন্নয়ন পরিকল্পনাকে পরিচালিত করবে।

পরবর্তী অংশে তিনি বাংলাদেশের অর্থনীতির পরনির্ভরশীলতার চরিত্রকে প্রচুর তথ্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে বৈদেশিক সাহায্যের ক্রমবর্ধমান পরনির্ভরতার মাত্রা ৯০% ছাড়িয়ে যাবে। অর্থনীতির খাতওয়ারী বিবেচনার পরিবার পরিকল্পনা, জ্বালানী ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং গ্রামীণ উন্নয়নের ৭৫ শতাংশ প্রকল্পই বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর। চলতি ভোগের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ফলাফলের ক্ষেত্রে দেখা গেছে বাংলাদেশের দারিদ্র ও অনুন্নয়ন দ্রুতগতিতে বাড়ছে। বাংলাদেশ ক্রমাগত ঋণগ্রস্ততার শিকার হচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্রমবর্ধমান পরিনতি রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে দেশটিকে পরনির্ভরতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বর্তমান সময় আমাদের দেশজ যেকোন পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর ক্ষেত্রে দাতা দেশ ও সংস্থাগুলোর হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন সমীক্ষায় দেখা গেছে এসব দেশ ও সংস্থা সাতটি ক্ষেত্রে বেশী মতামত ব্যক্ত করে– জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন, শিল্পায়ন, বাণিজ্য নীতি, আভ্যন্তরীন সম্পদ আহরণ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সাহায্য ও উন্নয়ন প্রশাসন ও সামাজিক সাম্য।" বৈদেশিক সাহায্য ও দারিদ্র একটি তত্ত্বীয় আলোচনা এবং বৈদেশিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন: বাস্তব চিত্র এ দুটো অংশে বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে আরও বিস্তারিত লিখেছেন। উপসংহারে তিনি লিখেছেন অনুন্নত বিশ্বের দারিদ্র দূরীকরণে বৈদেশিক সাহায্য তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে জাতীয় নীতিমালা যে আঙ্গিকে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার দারিদ্র দূরীকরণে সমর্থ হত, যে অবস্থা পরিবেশ বা আঙ্গিক কখনোই অনুন্নত দেশে সৃষ্টি হয়নি।

ডঃ সেলিম জাহান উন্নয়ন প্রসঙ্গে বৈদেশিক সাহায্যকে কেন্দ্র করে তার যে বক্তব্য তার প্রতি সমর্থন রেখেই আমি বৈদেশিক সাহায্য ও নারী উন্নয়ন বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করতে চাই। তার আলোচনার বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান পরনির্ভরতা ও অনুন্নয়নের বিষয়টি স্পষ্ট। নারী উন্নয়নের বিষয়টিও যেহেতু একান্তই বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর তাই এর ফলাফল কতটা ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক সে বিশ্লেষণ একান্তই জরুরী।

৫। মহিলা, কাজ ও এনজিও এক বাস্তব চিত্র নামক বইটিতে তাহেরা ইয়াসমীন এনজিও–র সংগে সংশ্লিষ্ট মহিলাদের অবস্থানগত সুবিধা অসুবিধাসহ তাদের উপস্থিতির বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। এতে প্রথম পর্যায় ভূমিকা ব্যাখ্যায় তিনি দেখিয়েছেন, মহিলারা বিভিন্ন ধরণের এনজিও–র সংগে যুক্ত হচ্ছেন। প্রথমত: খাদ্যের বিনিময়ে কাজ, আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ঋণ প্রদান এবং সচেতনতা প্রশিক্ষণ ও ঋণদান প্রভৃতি। এনজিও–র সংগে সংশ্লিষ্টতার ক্ষেত্রে মহিলারা যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন সে সম্পর্কেও আলোকপাত করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে তাহেরা ইয়াসমীন সপ্তগ্রামের নারী উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এ অংশে আমরা দেখতে পাই মহিলারা এনজিও–র সংগে সংযুক্ত হওয়ার ফলে তাদের আর্থিক পরিবর্তন হচ্ছে– মহিলারা আগ্রহী হয়ে তাদের সনাতন পারিবারিক কর্মকান্ডের বলয় থেকে নতুন নতুন কর্মকান্ডের সংগে জড়িত হচ্ছেন। এতে করে তারা নানাভাবে সামাজিক পরিমন্ডলে বাধাগ্রস্থ হচ্ছেন– এনজিওরাও তাদের যথেষ্ট কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে না। এর কারণহিসেবে দিখেয়েছেন এনজিওদের যথাযথ পরিকল্পনার অভাবকে। এভাবে তাহেরা ইয়াসমীন এনজিওতে সংশ্লিষ্ট মহিলাদের নিয়ে আলোচনাক্রমে এনজিওর ঋণদান পদ্ধতি প্রশিক্ষণ, সঞ্চয় কর্মসংস্থান প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে সপ্তগ্রাম ছাড়াও গ্রামীণ ব্যাংক, ব্রাককেও আলোচনায় এনেছেন। এছাড়াও গণউন্নয়ন সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট সমিতি, পল্লী গণউন্নয়ন কেন্দ্র দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। তার ভাষায় "এসব এনজিওর বেশীর ভাগেরই নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল পারিবারিক পর্যায় আয় বৃদ্ধি করা। এরা উপলব্ধি করেছে, মহিলাদের সম্পদ দিয়ে পরিবারের কল্যান আরও বাড়বে। সুতরাং এভাবে মহিলাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য হিসেবে নিয়ে অনেক এনজিও পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সফল হয়েছেন। কিন্তু তারা অবশ্যই বুঝার চেষ্টা করেননি কিভাবে মহিলারা এই মনোনিবেশের বাইরে থাকছেন।" সর্বশেষে তিনি "পরিকল্পনা কি খুঁজে দেখতে তবে এবং কি করা যেতে পারে?" এ শিরোনামে লিখেছেন এনজিওগুলো কিভাবে এবং কোন প্রক্রিয়ায় এগুলো তাদের কর্মকান্ডে সফলতা আনবে। এ পর্যায়ে তিনি লিখেছেন এনজিওগুলো কয়েকটি পদ্ধতিতে মহিলাদের আয়ের সুযোগ এবং বিনিয়োগ বাড়ানোর প্রচেষ্টা নিতে পারে। তার প্রথম পদক্ষেপ হল, এনজিওগুলোকে তাদের উদ্দেশ্যগুলোকে ভালভাবে যাচাই করে দেখতে হবে। এনজিওদের প্রাতিষ্ঠানিক সমতাকে বাড়াবার জন্য হিসাববিজ্ঞানের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। মহিলাদের জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য আয় এবং নিয়োগ সুবিধাকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করতে হবে এবং প্রশিক্ষণের যথার্থতা এর সংগে জড়িত। তার মতে এনজিওদের উচিত নিজেদের প্রতি ভালভাবে তাকানো এবং তাদের ও অন্যদের লব্ধ জ্ঞান হতে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং বাস্তবতা অনুযায়ী প্রকল্প পরিকল্পনা করা, যাতে মহিলারা উপকৃত হয়।

তাহেরা ইয়াসমীন মূলত: তার সমগ্র আলোচনা একটি বিশেষ দিকে ধাবিত করেছেন প্রথমত মহিলা, দ্বিতীয়ত তাদের এনজিও সংশ্লিষ্টতা, তৃতীয়ত: এনজিওর সীমাবদ্ধতা পরিমাপ ও তা থেকে পরিত্রাণের উপায়। সামগ্রিকভাবে তার বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় এনজিও-র সংগে জড়িত হওয়ার ফলে মহিলাদের সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে এনজিও-র ভূমিকা আলোচনায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব প্রকট। কেবলমাত্র এনজিও-র সীমাবদ্ধতা এবং সুবিধা অসুবিধা কর্তব্যের মধ্যে আনলেই চলবে না। এনজিও-দের প্রভাবে আমাদের গ্রামীণ নারীদের পরিবর্তনের সাথে রাষ্ট্রীক ও সামাজিক পরিসরের পরিবর্তনকেও ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। তার এ প্রয়াসকে বৃহত্তর বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতা বলে মনে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণাক্ষেত্র ও গবেষণা পদ্ধতি

আমি মাঠ পর্যায় তথ্য সংগ্রহের জন্য বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'আশা' (Association for Social Advancement)" এবং আশার সংগে সংশ্লিষ্ট গ্রামীণ মহিলাদের নিয়ে কাজ করার জন্য বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত পটুয়াখালী জেলার কালিকাপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত ডিবুয়াপুর গ্রামকে বেছে নিয়েছি। আশা এ গ্রামে ভূমিহীন পরিবারের মহিলাদের সংগঠিত করে গ্রুপের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী ঋণ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে আয় বৃদ্ধি প্রকল্প পরিচালনা করছে। এক কথায় এ প্রতিষ্ঠানটি গ্রামের ভূমিহীন মহিলাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে "Socio Economic Credit Programme" পরিচালনা করছে। এছাড়া ডিবুয়াপুর গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংক, কেয়ার কাজ করছে। আমি যখন কাজ শুরু করেছি ব্রাক তখনও ঐ অঞ্চলে ঋণ কর্মসূচীর উপর প্রাথমিক জরীপ করছিল। এছাড়া গ্রামীণ ব্যাংক ভূমিহীন পুরুষদের সংগঠিত করছে। কেয়ার এর রাস্তা বাধার কাজে কিছুসংখ্যক মহিলাও পুরুষ (অধিকাংশই) নিয়োজিত আছে। ডিবুয়াপুর গ্রামে ৯৬টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে আশা চল্লিশটি পরিবারের মহিলাদের সংগঠিত করেছে। গ্রামীন ব্যাংক ২০টি পরিবারে ২০ জন পুরুষ সদস্যকে এবং ব্রাক আরও ২০টি পরিবারকে সংগঠিত করার চেষ্টা করছে। বাকী ভূমিহীন পরিবারগুলো দিনমজুর কিংবা কাজ খুঁজছে।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণার প্রথম পর্যায় আমি ঢাকাস্থ 'আশা'র কেন্দ্রীয় অফিস থেকে কাগজপত্র সংগ্রহ করেছি এবং কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংগে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আশা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করেছি।

দ্বিতীয় পর্যায় আমি গ্রামে যাই এবঙ সমগ্র গ্রামের উপর জরীপ করি। এতে গ্রামের ভৌগলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পেশাগত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর বিভিন্ন জীবনধারা বিভিন্ন বিষয় তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে গ্রামের ভূমিহীন পরিবারগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছি।

তৃতীয় পর্যায় গবেষণার মূল অংশ আশার ভূমিহীন সমিতির চল্লিশজন সদস্যকে কেন্দ্র করে ভূমিহীন মহিলাদের অর্থনেতিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কিত বিষয় তথ্য সংগ্রহ করেছি।

এই গবষণার জন্য যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করেছি তার মধ্যে অন্যতম অংশগ্রণমূলক পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নপত্র প্রনয়ন, সাক্ষাৎকার গ্রহণ আলাপ আলোচনা এবং নির্বাচিত কেসস্টাডিসমূহ। প্রশ্নপত্রের ক্ষেত্রে কাঠামোগত ও অকাঠামোগত দুটো পদ্ধতিই নিয়েছি। কারণ গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের কেবলমাত্র কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার নেয়া সম্ভব নয়। তাদের কাছ থেকে তথ্য পেতে গিয়ে সহজভাবে আলাপ আলোচনার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। যে কারণে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র থাকলেও অকাঠামোবদধ পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার বিষয়কে কেন্দ্র করে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট একটি উদ্দেশ্য অবশ্যই গবেষকের থাকতে হয়। উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই গবেষক সংগ্রহ করেন বিভিন্ন তথ্য। এ তথ্যসমূহ যাচাই বাছাই করে তৈরী হয় ফলাফল। আমার গবেষণার শিরোনাম, "গ্রামীণ ভূমিহীন মহিলাদের উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যে"র ভূমিকা। এ পটভূমিতে আমি অবশ্যই বিষয়টিকে বিভিন্ন আঙ্গিকে দেখবো। বিশেষত বৈদেশিক সাহায্যের যে অংশ প্রকল্প কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের হাতে পৌছেছে তার মাধ্যমে তাদের প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন কতখানি

ঘটছে অর্থাৎ ভূমিহীন পরিবারের নারীরা কোন ধরণের অর্থনৈতিক কর্মে যুক্ত হচ্ছে? তারা যে অর্থ পাচ্ছে তার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আয়ের বৃদ্ধি ঘটিয়ে জীবনযাত্রার মান পরিবর্তনে সক্ষম কিনা? এসব জানা আবশ্যক। মূলত: পূর্বে ভূমিহীন পরিবারের নারীরা কি অবস্থায় ছিল বর্তমানে কেমন আছে। বৈদেশিক সাহায্য তাদের স্বনির্ভর হয়ে উঠতে সহায়তা করছে না পরনির্ভর করে তুলছে? অন্যদিকে বৈদেশিক সাহায্যের ম্যামে অর্থনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হলে পরিবার ও সামাজিক বলয়ে তার প্রভাব পড়ে কিনা সেটাও যাচাই করে দেখতে চাই। কারন আমি পুর্বেও উল্লেখ করেছি নারী উন্নয়নের পটভূমিতে নারীর অর্থনেতিক উন্নয়নকেই তাদের অধঃস্তন অবস্থা থেকে মুক্তির পথ হিসেবে দেখা হয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়সমূহের মধ্য দিয়ে আমি বৈদেশিক সাহায্যের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকসমূহ খুঁজে দেখার চেষ্টা করবো। নিম্নে উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করা হ'ল-

১। বৈদেশিক সাহায্য গ্রামীণ ভূমিহীন মহিলাদের অথনৈতিক উন্নয়নে কতখানি সহায়তা করছে?
২। মহিলারা কি স্বনির্ভরতা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে?
৩। মহিলাদের আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক মন্ডলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব কতটুকু?

আমি এ বিষয় নিয়ে কাজ করতে গিয়ে যাদের নিয়ে গবেষণা করতে চাই তারা বাংলাদেশের প্রান্ত:স্থিত ও দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী একটি বিশাল অংশের মধ্যেকার ক্ষুদ্রতম অংশ। এরা অনুন্নত। এদের জীবনযাপন পদ্ধতি মানবেতর। তাই বলে কোন বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এদের পরিবর্তিত জীবনধারার গতিশীলতাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কারণ এ সমস্ত গ্রামীণ নারীর অর্থনেতিক পরিবর্তন সমাজ ও রাজনীতির বৃহত্তর প্রেক্ষিতের সঙ্গেই যুক্ত। তাই যে নারী উন্নয়নের সঙ্গে যুক্তি হচ্ছে সে কোন সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত সে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য করেই উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে।

* ASA : Association for Social Advancement

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রাম ঃ পটভূমি

ডিবুয়াপুর (ডিক্কাপুরা, পটুয়াখালীতে যার নাম)

পটুয়াখালী জেলার কালিকাপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি গ্রাম। পটুয়াখালী মূল শহর থেকে দক্ষিণে দুই (২) কিলোমিটার দূরে এ গ্রামটির অবস্থান। কালিকাপুর ইউনিয়ন থেকে গ্রামটির দূরত্ব হবে এক (১) কিলোমিটার। আশার বসাকবাজার ইউনিটের অন্তর্গত এবং বসাকবাজার শাখা অফিস থেকে হেতালিয়া বাঁধঘাটা হয়ে এলে আড়াই ($২\frac{১}{২}$) কিলোমিটার এবঙ বসাকবাজার থেকে পটুয়াখালী ঘুরে এলে ছয় (৬) কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে যেতে হয়। পটুয়াখালী শহর থেকে দুটো পথে ডিবয়াপুর যেতে হয়। প্রথমত: রিক্সাযোগে বাঁধাঘাটা পেরিয়ে, দ্বিতীয়ত: কালিকাপুর হয়ে এলে ছোট্ট একটি খাল দিয়ে নৌকা যোগে। রিক্সায় মূল শহর থেকে ভাড়া ৮/৯ টাকা। নৌকাযোগে এলে রিক্সা ও নৌকাসহ ১০/১৫ টাকা লাগবে। গ্রামবাসীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য জানা যায় পূর্বে ডিবুয়াপুর ও পটুয়াখালীর মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র বাহন ছিল নৌকা। কারণ মাঝখানে জৈনকাঠী নদীর সাথে সংযোগকৃত বড় খাল থাকাতে নৌকায় যাতায়াত করতে হত। আমারও অবশ্য মনে পড়েছে ছোট বেলায় নানাবাড়ীর লোহালিয়া নদী থেকে নৌকাযোগে বড় খালের মধ্য থেকে মৃজাগঞ্জও যেতাম। জিয়াউর রহমানের সময়কালে (৭৮ সালে) বাধ দেয়া হলে ডিবুয়াপুর গ্রামের সংগে সরাসরি যাতায়াত ব্যবস্থা স্থাপিত হয়। গ্রামের মুখে রিক্সা ছেড়ে দিয়ে মুল গ্রামে ঢুকতে বিশ মিনিট সময় লাগে। গ্রামটির একটি সড়ক ব্যতীত সব সড়কই কাঁচা এবড়ো থেবড়ো। পাকা সড়কটিতে ইট বিছানো– কোথাও কোথাও ইট ভেঙ্গে গর্ত হয়ে খালের দিকে ঢালু হয়ে গেছে। এরাস্তার সাথে হেতালিয়া বাধঘাটা পর্যন্ত সংযোগ আছে। সেখান থেকে অবশ্য অন্যত্র যাতায়াত করা যায়। যেমন বসাকবাজার, সারিকখালী, আউলিয়াপুর, বোতলবুনিয়া এ রাস্তার মাঝে মাঝে রিক্সা চলাচল করতে দেখেছি। তবে গ্রামের লোকজন নয় বাইরের লোকজন কিংবা কোন সম্রান্ত বাড়ীর মহিলাদেরই অধিকাংশ দেখা গেছে।

১. স্থানিক বিবরণ

ডিবুয়াপুর গ্রামটির আয়তন ২৫৬ একর। গ্রামে ঢোকার পথে রিক্সা যেখানে থামে সেখান থেকে ডানদিকে (পশ্চিমে) এবঙ বাঁদিকে দক্ষিণে দুটো রাস্তা গ্রামের ভিতর চলে গিয়েছে। বাঁদিকের রাস্তা দিয়ে যেতে পাশেই একটি খাল। খালটি অনেক দিনের পুরানো– জৈনকাঠী নদীর সাথে এর সংযোগ ছিল। পূর্বে যখন যাতায়াতের মাধ্যম একমাত্র নৌকা ছিল তখন এ খালটির বহুবিধ ব্যবহার ছিল। যেতে যেতে দেখা যায় খালের মধ্যে দু'একটা ছোট নৌকা বাঁধা আছে। খালের পানিতে কাঠ, খেজুর কিংবা তালের সিঁড়ি দিয়ে গ্রামের মহিলারা ধোয়া মোছার কাজ করে। আবার এর পাড়েই কাঁচা পায়খানা দেখা গেছে। এপর ওপার সংযোগের জন্য একটি বাঁশের সাঁকো আছে।

গ্রামে চলাচলের কাঁচা সড়কগুলো মূল রাস্তা অনুপাতে নীচু ও ভাঙাচোরা। কেয়ার এ রাস্তাগুলোতে মাটি দেয়ার কাজ করছে। তাই দেখা গেছে শীতকালেও পথে কাঁদা জমেছে। বিশেষত খালের কাছের রাস্তাটিতে। এছাড়াও গ্রামের লোকজন এপাড়া ওপাড়া যাতায়াতের জন্য ধানক্ষেতের আইলও ব্যববহার করে। মূল রাস্তা দক্ষিণে গ্রামের শেষ প্রান্তে গিয়ে পশ্চিমের রাস্তার সাথে মিলেছে। এর পরেই রয়েছে সারিকখালী গ্রাম। গ্রামের মধ্যে ১০০টির মত পুকুর রয়েছে। পুকুরের পানি ধোয়ামোছা ও রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। গ্রামে ১৯৪টি

পরিবার টিউবওয়েলের পানি পান করে। ১টি পরিবার কুয়ার পানি খায়। গ্রামের সর্বত্র অসংখ্য বিল, ঝিল, পরিত্যক্ত জমি। বিল, ঝিলগুলো কচুরিপানা ও লতাগুল্ম ভর্তি। একটিতে শাপলার অস্তিত্ব আছে।

টিনের দোতালা কাঠের বাড়ী পটুয়াখালী জেলার ঐতিহ্য। ইটের পাকা বাড়ীতে বসবাসের ব্যাপক প্রচলন এখনও পটুয়াখালীতে শুরু হয়নি। জিলা শহরে কিছু কিছু পাকা বাড়ী তৈরী হলেও গ্রামে এর প্রভাব নেই বললেই চলে। ডিবুয়াপুর গ্রামেও ইটের কোন পাকা বাড়ী নেই। ১৯৫টি পরিবারের মধ্যে ৫০টি পরিবারের রয়েছে টিনের ঘর, ৭০টি পরিবারের চারিদিকে বাঁশের বেড়া ও উপরে টিনের চাল, বাকী ৭৫টি পরিবারের ধানের খড়, বাঁশও গোলপাতা দ্বারা তৈরী মাটির ঘর। (অবশ্য সবাই-ই মাটির মেঝে সম্পন্ন ঘরে বসবাস করে) গ্রামে বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংকের সহায়তায় গৃহনির্মান কর্মসূচীর আওতায় আরও কিছু টিনের বাড়ী তৈরীর সম্ভাবনা রয়েছে। একেবারে দরিদ্র শ্রেণী ছাড়া প্রতিটি বাড়ীরই রয়েছে বারান্দা (হাইতনা)। ঘরটি উঠোন অনুপাতে উঁচুতে থাকায় অনেক বাড়ীতে ঘরের সামনে মাটির সিঁড়ি তৈরী করা হয়। অবস্থানপন্ন পরিবারের বাড়ীতে বাড়ীর এ সব সিঁড়ি কিংবা পুকুর ঘাট কাঠের বা ইট, সিমেন্ট দ্বারা পাকা করে নেয়া নেয়। ১৯৫টি পরিবারের মধ্যে ৪০টি পরিবার (গ্রামীণ জীবনধারানুযায়) স্বচ্ছল। অর্থাৎ মধ্যবিত্তের পর্যায় পড়ে। তিনবেলা খেয়ে পড়ে চলতে পারছে। ৮টি পরিবার উচ্চবিত্তের পর্যায় পড়ে। ২০টি পরিবার নিম্ন মধ্যবিত্ত, ৩১টি নিম্নবিত্ত এবং বাকী ৯৬টি পরিবার সম্পূর্ণ ভূমিহীন। ৩০টি বাড়ীতে টিউবওয়েল, কাচারীঘর (বাংলা ঘর বা দহালজ, যেখানে বাইরের লোকজন ওঠাবসা করে) এবং বড় পুকুর আছে। এ পুকুর গুলির মধ্যে ৮টি বাড়ীর পুকুরকে গ্রামে দীঘি বলা হয় কারণ এগুলো বেশ বড়। গ্রামে পূর্বে এ দীঘির পানি পান করত। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ৮টি বাড়ীতেই মসজিদ আছে। ঐ গ্রামে এ জিনিস চোখে পড়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারগুলোও ছোট করে বাঁশের বেড়া দিয়ে হলেও বাড়ীর আঙিনায় মসজিদ রাখতে পছন্দ করে।

ডিবুয়াপুর গ্রামের ৯৬টি ভুমিহীন পরিবারের চাষের ধানী জমি এবং ভিটাবাড়ী অসুস্থতা, বেকারত্ব, মেয়ের বিয়ে, খরায় ফসলহানি, চাষ দিতে গিয়ে ঋণ নেয়া, মহাজনী ঋণ শোধ দিতে না পারা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে বন্ধক, পাট্টা ও কওলা (একবারে বিক্রী) করে এরা নিঃস্ব হয়েছে। এদের অনেকেই তাদের নিজস্ব ধনী আত্মীয়দের নাম উল্লেখ করেছে যারা প্রতারনা করে জমি নিয়ে গিয়েছে। সময়মত টাকা পরিশোধের অক্ষমতার কারণে জমি হাতছাড়া হয়ে গেছে। তবে সাধারণত মাতবর, চেয়্যারম্যান, জোতদার শ্রেণীর লোকেরা জমি জমা বন্ধক, পাট্টা ও কওলা রাখে। ৯৬টি পরিবারের মধ্যে ৪০টি পরিবার আত্মীয় বাড়ীতে কিংবা বন্ধকী বা বিক্রীকৃত ভিটা বাড়ীতে বসবাস করে। গ্রামে এদের করুণার চোখে দেখা হয়। তবুও এ শ্রেণীর লোকেরা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয় না। নিজের গ্রামে অনাহারে বসবাস করতেও এরা নিরাপদ মনে করে।

টিনের বাড়ীতে বসবাস করা গ্রামবাসীদের বিরাট আকাংখা। কিন্তু একবান টিনের দাম ৫ থেকে ৮ হাজার টাকা পর্যন্ত। এটা অনেকেরই সাধ্যের বাইরে। ভূমিহীনরা টিনের ঘরে বসবাস করাকে ধনীক শ্রেণীর প্রতীক হিসেবে মনে করে। এ শ্রেণীর পরিবারগুলো বছর অন্তর ধানের খড় গোলপাতা পরিবর্তন করে ঘরের কাজ সম্পন্ন করে। এরা জানায় ধানের খড় পুরানো হয়ে গেলে বর্ষাকালে বসবাস করা দু:সাধ্য হযে উঠে।

ঐ গ্রামে জ্ঞাতিগোষ্ঠী নিয়ে একই ঘরে বসবাস করার চেয়ে একই বাড়ীতে পৃথক বসবাস করার প্রবণতা বেশী। ৬০% বাড়ীতে হাইতনা বা বারান্দা আছে। নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা একটি বড় ঘর ও একটি ছোট বারান্দার মধ্যে বসবাস করে। একেবারে দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা একটি ঘরে অনেকজন একত্রে থাকে। উচ্চবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত পরিবারে ৪/৫টি ঘর নিয়ে খোলামেলাভাবে বসবাস করে। পুরো শুকনো মৌসুমে গ্রামবাসী ঘরের পেছনে খোলা জায়গায় মাটির উনুন বসিয়ে রান্না করে থাকে। গরীব পরিবারগুলো বর্ষার দিনে ঘরে মাটির আলগা চুলোতে রান্না করে। এদের জ্বালানীর প্রধান উৎস ধানের খড়, শুকনো গাছের পাতা, ডাল, গোবর দিয়ে তৈরী ঘুটে, চালের কুড়ো প্রভৃতি। এ গ্রামে ব্যবসায়ী ভিত্তিতে মাছের চাষ হয় না বললেই চলে। অবস্থানপন্ন গৃহস্থরা নিজেরা খাওয়ার জন্য পুকুরে মাছ ছাড়ে। তবে সব শ্রেণীর মানুষ খালে বিলে মাছ শিকার করে। গরীব পরিবারগুলো মাছ খায় কদাচিৎ।

ডিবুয়াপুর গ্রামে চারটি পাড়া (কান্দা) রয়েছে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম। আমার গবেষণা এলাকা ছিল পূর্ব ও উত্তর পাড়া। এ দুটো পাড়ায় অধিকাংশ ভূমিহীন পরিবার বসবাস করে।

৩। জনসংখ্যা : ডিবুয়াপুর গ্রামের লোকসংখ্যা ১২১৫ জন। মোট পরিবার ১৯৫টি। বাড়ী ১৭০টি। ১৯৫ ঘরই মুসলমান কোন হিন্দু বসতি নেই পূর্বেও ছিল না বলে জানা গেছে। জনসংখ্যার ৬০৯ জন মহিলা ও ৫৭৬ জন পুরুষ। নিম্নে সারণীর মাধ্যমে লিঙ্গভিত্তিক বয়স অনুসারে জনসংখ্যা দেখানো হ'ল–

সারনী – ৩

বয়স	নারী	পুরুষ	মোট	শতকরা হার (%)
০–১	২৫	২০	৪৫	৩.৭%
১–১৫	২২০	১৯২	৪১২	৩.৪%
১৫–৫৫	২৬৪	২৬৮	৫৩২	৪৩.৭৯
৫৫ বছর এবং তদুর্ধ	১৩০	৯৬	২২৬	১৮.৬%
	৬৩৯	৫৭৬	১,২১৫	১০০%

১৯৬টি পরিবারের মধ্যে তিনটি নারী প্রধান পরিবার। তিনজনই বিধবা এদের কোন পুরুষ অভিভাবক নেই।

শিক্ষা

ডিবুয়াপুর গ্রামে শিক্ষার হার ৪১.৫%। ৭ বছর এবং তদুর্ধ পুরুষ ৫০% ও মহিলা ৩১.[illegible]%। গ্রামে ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। স্কুলের নাম ডিবুয়াপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১টি হাইস্কুল রয়েছে। হাইস্কুলের নাম ডিবুয়াপুর হাই স্কুল। মেয়েদের ১৩/১৪ বছরোপর বিদ্যালয় পড়াশুনা করতে দিতে অভিভাবকদের প্রবল আপত্তি রয়েছে। প্রথমত: হাইস্কুলটি কো–এডুকেশন কারন মেয়েদের স্বতন্ত্র কোন স্কুল নেই। দ্বিতীয়ত: মেয়েদের স্কুল পটুয়াখালী শহরে। অতদূরে পিতামাতা মেয়েদের পড়তে পাঠাতে সাহস করেন না। তারা একথাটিও মনে করেন মেয়ে বেশী পড়াশুনা করলে বেশী টাকা যৌতুক দিয়ে বর আনতে হয়। ২% বাবা মা মনে করেন বর্তমান সময়ে মেয়ে সন্তানদের অন্তত মেট্রিক পাশ করানো উচিত। ৩০% বাবা মার মতে কন্যাসন্তান বেশী পড়াশুনা করলে গ্রামে নানা ধরনের সমস্যা তৈরী হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় ২/৪ ক্লাস (তৃতীয়/চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত) পড়লেই চলে। ১৮% অভিভাবক বলেন পড়ালেখা করা ভাল কিন্তু গ্রামে পড়াশোনা করে কি লাভ? ৫০% অভিভাবক একেবারেই পড়াতে চান না। পুত্র সন্তানদের বেলায় অভিভাবকদের বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু সামর্থের কারণে অধিকাংশই পড়াশোনা করে না। তাছাড়া চাষাবাদের কারণে অনেককে পড়াশুনা ছেড়ে দিতে হয়। নিম্নে ডিবুয়াপুর গ্রামে স্কুলগামী নারী ও পুরুষের সংখ্যা দেখানো হল–

সারনী – ৪

বয়স	নারী স্কুলে		শতকরা (%)	পুরুষ স্কুলে		শতকরা হার
	যায়	যায় না		যায়	যায় না	
৫–৯	৩৭	৪৩	৪৬.২৫%–৫৩.৭০%	৩৯	৩৭	৫১.৩২%–৪৮.৬৮
১০–১৪	৪৪	২৩	৬৫.৬৭%–৩৪.৩৩%	৫৭	১৯	৭৫%–২৫%
১৫–২৪	১৪	৯৪	১৩.৪৬–৮৬.৫৬%	৩১	৭৮	২৮.৪৪%–৭১.৫৬%

গ্রামের ছেলেমেয়েরা বেশী বয়সেই সাধারণত স্কুলে যায়। ৮/৯ বৎসর বয়সে অনেকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। শিক্ষা নিয়ে ডিবুয়াপুর গ্রামের নানা ধরণের মন্তব্য আছে। বিশেষত বিত্তবান ও মধ্যশ্রেণীর লোকেরা সন্তানদের শিক্ষা দেবার চাইতে মেয়েদের দ্রুত বিয়ে ও ছেলেদের গৃহস্থালী কাজে নিয়োজিত করাটাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। মেয়েদের পড়ানোর ক্ষেত্রে পর্দার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ অভিভাবকদের কাছে।

৫। **স্বাস্থ্য**

ডিবুয়াপুর গ্রামে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অনুন্নত। গ্রামবাসীরা চিকিৎসাার জন্য হোমিওপ্যাথী, কবিরাজী ঝাড়ফুঁক এর উপর নির্ভর করেন বেশী। জটিল বা দীর্ঘদিন আক্রান্ত রোগের চিকিৎসা করাতে পটুয়াখালী জিলা শহরে প্রাইভেট ডাক্তার কিংবা সদর হাসপাতালে যেতে হয়। ভাল হোমিওপ্যাথী চিকিৎসাও শহরেই করতে হয়। গ্রামে কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। গ্রামের নিম্নবিত্ত, ভূমিহীন পরিবারগুলো আর্থিক সঙ্গতি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে অসচেতনার কারণে শহরে গিয়ে ডাক্তার দেখান না। তাদের মতে হাসপাতালে তাদের জন্য ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। গ্রামের গরীব রোগীদের গুরুত্ব দেয়া হয় না। মহিলাদের গর্ভধারণজনিত জটিলতা নিয়েও তারা উদ্বিগ্ন নন। সাধারণ জ্বর, সর্দি কাঁটাছেড়া, ডায়রিয়া এমনকি ছোট শিশুর নিমোনিয়া হলেও তারা সহজে ডাক্তারের কাছে যান না। আল্লাহ্ রোগমুক্তকরবেন এমন একটি ধারণা তাদের মধ্যে সবসময় কাজ করে। গ্রামে এনজিও কাজ করার ফলে কিছুটা সচেতনতা তৈরী হলেও বাস্তবিকপক্ষে দীর্ঘদিনের অনভ্যাসের কারণেও স্বাস্থ্য সম্পর্কে গ্রামবাসীরা মনোযোগী নন। দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা বলেন, "খেয়েই বাঁচতে পারি না তার আবার চিকিৎসা"। ২% জনগণ শহরে গিয়ে স্বাস্থ্য সুবিধা নেন। যেহেতু তাদের অর্থ আছে তারা এ সুবিধা ভোগ করতে পারেন। তবে গ্রামে যদি চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকত তা'ল কমবেশী সবাই ডাক্তারের কাছে যেত। তাদের ধারনা শহর কাছে বলেই গ্রামে চিকিৎসার ব্যাপারে অবহেলা রয়েছে।

৬। **পশুপালন, উদ্ভিদ ও শস্য**

ডিবুয়াপুর গ্রামে গাছপালা যথেষ্ট। ৭০% বাড়ীতে আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, তাল, নারিকেল, খেঁজুর, বড়ই প্রভৃতি গাছ বিরাজমান। ভাল জাতের ফল বলতে এরা আম, কাঠাল এবং নারিকেলকেই বোঝেন। খুব দরিদ্র পরিবারের বাড়ীতে নিদেনপক্ষে একটি বড়ই গাছ এবং নারকেল গাছ আছে। গ্রামের ফলন বেশী কলা, নারিকেল, বড়ই, তাল এগুলোর। কাঁচা ও পাকা তাল, ডাব, নারিকেল বাজারে বেশী বিক্রী হয়। বড় কোন বিক্রয়যোগ্য গাছ বলতে এরা কড়ই, জাম এগুলোকেই বোঝে। আম, কাঠাল এসবের ফলন বৃদ্ধিতে এরা তেমন সচেষ্ট নয়– ব্যাপক ভিত্তিতে কলা ও নারিকেলের চাষ হয়।

এ গ্রামের শস্য বলতে ধান, ধনচে, কাঁচামরিচ, খেসারী ও মসুর ডাল। পটুয়াখালী অঞ্চলের লোকজনের সম্পর্কে সাধারন একটি মন্তব্য আছে এরা বেশী পরিশ্রমী নয়– উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এদের রয়েছে অনীহা। ডিবুয়াপুর গ্রামে গিয়ে সে সত্যটাই নতুনকরে দেখতে হল। বাড়ীর আশেপাশে, খোলা জমিতে তেমন কোন শীতের শাকসব্জী চাষের ব্যবস্থা নেই। কোন কোন বাড়ীতে লাল শাক এবং লাউগাছ বোনা হয়েছে। সব্জী বলতে কাঁচাকলা, বেগুনের চাষ হয়। গ্রামের লোকজন কিনে খেতেই বেশী অভ্যস্ত বিশেষত সব্জী। এ অঞ্চলে কখনোই পটলের চাষ হয়নি। বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজরের চাষ হয় না বললেই চলে। ৩/৪টি বাড়ীতে দেখেছি কিছু ফুলকপির চাষ করা হয়েছে। ব্যাপক ভিত্তিতে শাক সব্জীর চাষ গ্রামে হয় না বললেই চলে।

পশুপালনের দিক থেকে বলতে গেলে গরু, ছাগল, হাস, মুরগী, কবুতর পোষা হয়। সর্বত্র গরু পালনের উপর জোর দেয়া হয় বেশী। এতে তারা দু'দিক থেকে লাভবান হয়। একদিকে হাল চাষের কাজ করা যায়, অন্যদিকে গাভী পুষলে দুধ পাওয়া যায়। গ্রামে একটি দরিদ্র পরিবার গাভী পোষে এবং দুধ বিক্রী করে সংসার চালায়। সব বাড়ীতেই যে গোয়ালঘর আছে তা নয়। কোন কোন বাড়ীতে গাছের সাথে গরু বেধে রাখা হয়। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো গরুর পাশাপাশি ছাগলও পোষে। ইদানিং গ্রামে হাঁসমুরগী পালনের উপর

গুরুত্ব বেড়েছে। দরিদ্র পরিবারগুলো হাঁস-মুরগীর ডিম খাবার হিসেবে ব্যবহার করার চেয়ে বিক্রী করতে বেশী পছন্দ করে। কারণ এর থেকে প্রাপ্ত টাকা সংসারে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খাতে ব্যবহৃত হয়। গ্রামের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে চাষের জমি হাতে না থাকাতে এবং সংসারে অভাবের তাড়নায় বহু পরিবার তাদের হালের বলদ গরু বিক্রী করে দিয়েছে। তারা এখন একটি গাভী কিনতে যতটা আগ্রহী হালের বলদ কিনতে ততটা আগ্রহী নয়।

৭। অর্থনেতিক অবস্থা

ডিবুয়াপুর গ্রামের অর্থনেতিক অবস্থা গতিহীন। অভাব অনটন এবং দারিদ্র এদের ঘর,বাড়ী, পোষাক, পরিচ্ছদ, আচার-আচরণে স্পষ্ট। গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবারগুলো দারিদ্র, দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির সংগে রীতিমত যুদ্ধ করে জীবন চালাচ্ছে। ভূমিহীন পরিবারগুলোর দু:খ দুর্দশা নিত্যসঙ্গী। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলো তিনবেলা খেয়ে পড়ে বাঁচার জন্য অহরহ লিপ্ত। কেবল উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো ভাল অবস্থানে আছে। গ্রামীণ জনগনের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র ভিত্তি চাষাবাদ- কিন্তু বর্তমানে এনজিও কাজ করার ফলে ভূমিহীন পরিবারগুলো চাষাবাদের পরিবর্তে ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত হচ্ছে। ৯৬টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৬২টি পরিবারের ১বিঘার নীচে কিছু জমি আছে। ২৭টি পরিবারের একেবারেই চাষের জমি নেই। বাকী ১৭টি পরিবারে ১$\frac{১}{২}$ বিঘা কিংবা ১ বিঘা করে জমি আছে। এ জমি চাষাবাদ করে তাদের জীবনধারণ করা দুরহ। কারণ ফসল দিতে গেলে যেমন খরচ তেমনি ফসল ঘরে উঠালেও হাতে পারিবারিক খরচ চালাবার মত সামর্থ হয় না। নীচে ১ বিঘার নীচে যাদের জমি আছে তা শতকরা হিসেব দেয়া হ'ল-

সরানী ৫

জমির পরিমান	সংখ্যা	শতকরা হার
০-১০ শতাংশের মধ্যে	৪২ জন	৬৮%
১১-২০ শতাংশের মধ্যে	৮জন	১৩%
২১-৩০ শতাংশের মধ্যে	৫ জন	৮%
৩১-৪০ শতাংশের মধ্যে	২ জন	৩%
৪১-৫০ শতাংমের মধ্যে	৫ জন	৭%
	৬২ জন	৯৯%

বাকী ৯৯টি পরিবারের মধ্যে ৮টি পরিবারের হাতে রয়েছে ৫০/৬০ বিঘা জমি। ৪০টি পরিবারের ২০ থেকে ২৫ বিঘা করে চাষের জমি আছে। ২০টি পরিবারের ৫ কিংবা ৭ বিঘা এবং ৩১টি পরিবারের ৩/৪ বিঘা করে জমি আছে। গ্রামীণ জনগনের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় চেয়ারম্যান, মেম্বার এবঙ মাতব্বর শ্রেণীর লোকদের নিয়ন্ত্রনে গ্রামের জমি চলে যায়। বর্তমানে বন্ধক, পাট্টা না দেয়ার ব্যাপারে কিছুটা সচেতনতা তৈরী হলেও পূর্বে বহু জমি গরীব চাষীদের কাছ থেকে হাতছাড়া হয়ে গেছে। মহাজনী ঋণ শোধে অক্ষমতা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি,অসুস্থতা, ফসল না হওয়া, স্বামীর মৃত্যু, জীবিতকালে কর্মহীনভাবে জীবন যাপন করা ইত্যাদি জমি নি:শেষিত হবার কারণ।

গ্রামে চাষাবাদের অন্যতম উপকরণ লাঙ্গল বলদ। স্বল্পসংখ্যক পরিবার জমিতে যন্ত্রচালিত মেশিন ব্যবহারের সুবিধা ভোগ করে। পানি সরবরাহের জন্য ট্রাকটর পাম্পের মাধ্যমে খালের সাথে সংযোগ কেটে দেয় হয়। ঐ এলাকায় খাল বিলের সংখ্যা বেশী বলে চাষের জন্য ক্ষেতের সাথে নালা কেটেও পানি সরবরাহ করা হয়। তাতেও পানির চাহিদা পূরণ হয় না। বিশেষত শুষ্ক মৌসুমে। বৃষ্টির জন্য নির্ভরশীলতা তো আছেই। স্যালো মেশিনের ব্যবহার করা হয় কদাচিৎ।

Dhaka University Institutional Repository

ডিবুয়াপুর গ্রামে যাদের চাষাবাদের জমির পরিমাণ ১০ বা ৫ বিঘা তারা নিজেরাই নিজেদের জমি চাষ করেন। নিড়ানো বা বীজ বপনের জন্য ১জন কামলা বা বাড়ীর কাউকে সাথে নিয়ে নেন। ৫০/৬০ বিঘা ভূমি মালিকরা বর্গা বা ভাগচাষীদের মাধ্যমে জমি চাষ করান। যেমন ডিবুয়াপুর গ্রামের চেয়ারম্যান আব্দুর রব শহরে বসবাস করেন। তার চাষের জমি বর্গাদারকে দেয়া। কখনো কখনো একই বর্গাদার ২০/২৫ বছর ধরে জমি চাষ করেন। আবার ভূমি মালিক ইচ্ছা করলে ২/৩ জনের মধ্যে ভাগ করে দেন। সবকিছুই নির্ভর করে বর্গাদার ও ভূমি মালিকদের সম্পর্কের উপর। মালিক যদি মনে করে বর্গাদার তাকে ফসলের সঠিক হিসেব দেয় না, তাহলে পুরানো বর্গাদারের স্থলে নতুন বর্গাদার নিয়োগ করতে পারেন। গ্রামে যার ৫ বিঘা জমি আছে সেও অন্যের জমি ভাগে নিয়ে চাষ করে। এতে তার পরিবারের ফসলের পরিমানটা বৃদ্ধি পায়। যদিও গ্রামে চাষের সংগে জড়িত লোকেরা জানিয়েছেন ফসল ফলাতে তারা যে শ্রম ও অর্থ ব্যয় করেন সেই অনুপাতে ফসলের মূল্য পান না। তাছাড়া জমির কার্যকারিতাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তবুও এক খন্ড জমিতে চাষ করে ফসল ফলাতে কৃষকদের আগ্রহের অন্ত নেই।

গ্রামের জনগণ চাষাবাদ ছাড়া আরও কিছু কাজকর্মে লিপ্ত আছেন। এদের পেশাগত দিকটি সারণীর মাধ্যমে তুলে ধরা হ'ল–

সারনী – ৬

পেশা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
কাজ খুঁজছে	০	
গৃহকর্ম	২২৬	৪৭.৬৮%
কৃষি	১৮৬	৩৯.২৪%
শিল্প	নাই	০
ব্যবসা	৩	১.৬৮%
চাকুরী	৮	১০.৫৫%
বিবিধ	৫০	৩৯%
কবিরাজ	১	
	৪৭৪	

এছাড়াও ক্ষেতের কামলা বা যোগানদার হিসেবে ধানক্ষেতে নিড়ানি দেয়া, বীজ তোলা, ধান কাটা, মাড়াই করা প্রভৃতি কাজে দৈনিক নির্দিষ্ট মজুরীর ভিত্তিতে অনেকে কাজ করে। অবশ্য সে সময়টা ধানরোপন ও তোলার সময়কার। এ কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে ১জন মজুর প্রতিদিন ২ বেলা খাবার এবংকাজ শেষে ১৫/২০ সের ধান পান।

ডিবুয়াপুর গ্রামে ব্যবসায়ী বলতে ধানচাল, শাকসব্জী, মাছ, ডিম বাজারে সরবরাহ করাকেই বোঝায়, ৮জন চাকুরীজীবীর মধ্যে ৩জন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক, ১জন ডিসি অফিসের কেরানী, ৩জন হাইস্কুলের শিক্ষক ও ১জন মাদ্রাসা শিক্ষক।

পেশাগত দিক বের করার পরও মাসিক আয়ের গরমিল হয়েছে। এক্ষেত্রে পরিবারে পুরুষ ও মহিলার আয়, খাদ্য গ্রহণের পরিমান, চাল, ডাল, তেল, মরিচ, লবনের খরচ, কাপড় চোপড় প্রভৃতি দ্বারা হিসাব করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে ধনী পরিবারের অবস্থা ভিন্নতর। তারা ধান, চাল, ডাল, মরিচ বাজারে বিক্রী করে জিলা শহরে ব্যাংকে রাখে। অথবা গোলা তৈরী করে উপরোক্ত শস্য মজুদ করে এবং বর্ষাকালে বাজারে বিক্রীর জন্য পাঠান। এছাড়াও শস্য বিক্রীর টাকা দিয়ে তারা বছরের রান্নার সামগ্রী ক্রয় করে রাখেন। কাঁচাবাজারের

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

382793

প্রয়োজনে পুকুরের মাছ ধরে কিংবা কিনে খান। শাকসব্জী চাষ করেন কিংবা ক্রয় করেন। নিম্নে ডিবুয়াপুর গ্রামের ১৯৫টি পরিবারের আয়ের হিসাব টাকায় দেখানো হ'ল-

সারনী - ৭

আয় (টাকায়)	সংখ্যা (গৃহ)	শতকরা হার (%)
৩০০ টাকা	৪০	২০.৫১%
৩০১-৫০০	৪৫	২৩.০৮%
৫০১-১০০০	৬০	৩০.৭৭%
১০০১-২০০০	৩০	১৫.৩৮%
২০০১-৩০০০	৮	৪.১%
৩০০১-৪০০০	২	১.০২%
	১৯৫টি গৃহ	১০০%

নিম্নে দেখানো হ'ল পরিবার পিছু খাবার গ্রহণের বার।

সারনী - ৮

বার	গৃহ সংখ্যা	শতকরা হার (%)
১ বেলা	৪০	২০.৫২%
২ বেলা	৬০	৩০.৭৬%
৩ বেলা	৯৫	৪৮.৭২%
	১৯৫টি গৃহ	১০০.০০%

এছাড়াও পাওয়া গেছে ভোরবেলা পান্তা খেলে অনেকে দুপুরের খাবার সন্ধ্যায় খান। রাতের খাবার খান না এবং একবেলা খাবার খরচ করতে হয় না। এটি অভ্যাসের ব্যাপার। গরীব পরিবারগুলো লবন, মরিচ, শাক সহযোগে ভাত খান। মাছ মাংসের বেলায় দেখা গেছে স্বচ্ছল পরিবার মাছ, মাংস মাসে ১৫/২০ দিন অবশ্যই খান। গ্রামে সব পুরুষরাই লুঙ্গি পরিধান করেন এবং সঙ্গে জামা। তবে ১০০টি পরিবারের পুরুষ শুধুই লুঙ্গি পরিধান করেন। হাটবাজার কিংবা কোন উৎসবে জামা গায়ে দেন। মহিলারা মোটা জমিনের ৯০/১২০ টাকার মধ্যে পরিধান করেন। পেটিকোট সবাই পড়েন না। স্বচ্ছল পরিবারের পুরুষ মহিলা উভয়ই ভাল কাপড় চোপড় পরিধান করেন।

৮। বৈবাহিক মর্যাদা

বিবাহ ডিবুয়াপুর গ্রামের নারী পুরুষ উভয়ের জীবনধারার একটি গুরত্বপূর্ণ অংশ। যদিও গ্রামে যৌতুকের প্রকোপ অস্বাভাবিক তবুও বিয়ে সংগঠিত হচ্ছে, যৌতুকের দায় কন্যা ঘরে ফিরছে, নির্যাতিত হচ্ছে। অভিভাবকরা ১৪ বছর বয়সের পর কন্যাসন্তানকে ঘরে রাখা বিরাট দায়গ্রস্ততা বলেই মনে করেন। কিন্তু অভাব অনটনে ভাল পাত্রের বন্দোবস্ত করতে না পারা প্রভৃতি কারণে বর্তমানে ঐ গ্রামে বহুসংখ্যক মেয়ে বিবাহযোগ্যা হয়ে আছে। একটি দরিদ্র পরিবারের মেয়ের বিয়েতে ন্যূনতম ৮/১০ হাজার টাকা খরচ হয়। অভিভাবকগণ নিঃশেষ হয়ে কন্যা বিদায় করেন। সামাজিক এ ব্যাধি ঐ গ্রামের কন্যাসন্তানদের বেলায় যেমন প্রকট ছেলে সন্তানদের বেলায় নয়। অভিভাবকরা পুত্র সন্তানের আয়ের পথ তৈরীর পর বিয়ে দেয়া সঠিক বলে মনে করেন। কারণ এতে পিতামাতা কিছুদিন পুত্রের আয়ের উপর নির্ভর করতে পারেন। আবার পুত্রকে বিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

করালে ভাল যৌতুক ছাড়া অগ্রগামী হন না। এটুকুও বাবা মায়ের লাভ। কারণ বিয়ে পরবর্তীতে দেখা যায় প্রায়শই যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যায়। তখন পিতা ছেলের উপর নির্ভর করলেও তাকে গলগ্রহ হয়ে থাকতে হয়। ছেলের বিয়েতে অভিভাবকরা নগদ টাকা প্রাপ্তিতে বেশী আগ্রহী।

গ্রামে আয়ের বিকল্প পথ সৃষ্টির পূর্বেও অনেকে বিয়ে করেন। বিশেষত উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা বাবা-মার চাহিদা পূরণের নিমিত্তে কিংবা স্বেচ্ছায়ই বিয়ের পিঁড়িতে বসেন। বহুবিবাহ এবং মেয়েকে বাবার ঘরে ফেরৎ পাঠানো ঐ গ্রামে হরহামেশা ঘটছে তবুও সমাজে কন্যার দুর্নামের ভয়ে বাবা মা যততাড়াতাড়ি সম্ভব কন্যাকে পাত্রস্থ করেন। বিবাহ গ্রামীণ সমাজে অভিভাবকদের মর্যাদা বাড়ায়। নিম্নে ডিবুয়াপুর গ্রামে নারী পুরুষের বৈবাহিক জীবনের চিত্র নিম্নে দেখানো হ'ল-

সারনী - ৯

বিবাহিত		শতকরা হার		অবিবাহিত		শতকরা হার	বিপত্নীক/বিধবা		
পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী		পুরুষ	নারী	শতঃ হার
২১৭	২৩৩	৩৭.৬৭%	৩৬.৪৬%	১৫৮	৯৩	৬২.৩৩%	১	২৮	১-৪.৩৮%
						৬৩.৫৪%			

৯। প্রশাসন

ডিবুয়াপুর গ্রামের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় শালিসী প্রথা এবং ইউনিয়ন কাউন্সিলের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি রয়েছে। গ্রামের ভেতরকার ঝগড়া ফ্যাসাদ, জমির আইন সংক্রান্ত বিরোধ, যৌতুকের অভাবে মেয়ে ফেরৎ, জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পত্তি ভাগের বিরোধ এগুলো সাধারণত: শালিসী বৈঠকের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়। শালিসীতে গ্রামের অবস্থাপন্ন ও বিচক্ষণ জোতদার চেয়ারম্যান, তার অনুপস্থিতিতে মেম্বার এবং গ্রামের মাতবর শ্রেণীর লোকদের সমন্বয়ে গঠিত বৈঠকে সমস্যার নিষ্পত্তি ঘটে। শালিসী ব্যবস্থায় সমস্যার সমাধান না হলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে আইনমাফিক বিচার চাওয়া হয় এবং কনসুলেশন কোড অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদ যেকোন সমস্যার নিষ্পত্তি করে। এক্ষেত্রে চেয়ারম্যান, গ্রামের শালিস হিসেবে প্রধান দু'জন ব্যক্তি ও দু'জন মেম্বারের উপস্থিত থাকতে হয়। তবে জমিজমা সংক্রান্ত বড় বিবাদ জিলা শহরে কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। ইউনিয়ন পরিষদ সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত মামলার নিষ্পত্তি ঘটায়।

ডিবুয়াপুর গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক সর্বোচ্চ স্তর হলেও যদ্দিন গ্রামে গিয়েছে দেখেছি অফিস তালাবদ্ধ। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জানা গেছে কেবলমাত্র কোন এজেন্ডা নিয়ে মিটিং থাকলে পরিষদ অফিস বসে। গ্রামের চেয়ারম্যান, মেম্বাররা শহরে বসবাস করেন। চেয়ারম্যানকে প্রয়োজনে গ্রামের কোন ব্যাপারে খবর দিয়ে আনতে হয়। ইউনিয়ন পরিষদ অফিস ধুলা মাখা চেয়ার টেবিল ব্যতীত কিছুই চোখে পড়েনি। ঐ অফিস গ্রাম সংক্রান্ত বিস্তারিত কোন তথ্য সংগ্রহ করে না। কয়েকদিন ঘুরে গ্রামের সরকারী বিবরণ সংগ্রহ করতে আমাকে আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিসে যেতে হয়েছে। সেখানেও অবশ্য তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। এনজিও গ্রামে কাজ করার পর গ্রামের লোকদের স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীলতা কমে গেছে। এনজিও সংযুক্ত সদস্যরা চেয়ারম্যান, মেম্বারদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে- আবার গ্রামীণ সমস্যা মিটাতে এদেরই দ্বারস্থ হয়।

১০। গ্রামীণ রাজনীতি

ডিবুয়াপুর গ্রাম পটুয়াখালী শহরের নিকটবর্তী বলে দলীয় রাজনীতি ও গ্রামীণ রাজনীতি একই সূত্রে গাঁথা। তবে রাজনীতি উপরতলার জনগণের করতলগত। অর্থাৎ রাজনীতির সঙ্গে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পর্ক

Dhaka University Institutional Repository

ঘনিষ্ট ও দৃঢ়। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় ডিবুয়াপুর গ্রামে কখনোই কোন নিম্নবিত্ত বা দরিদ্র পরিবার থেকে চেয়ারম্যান কিংবা মেম্বার পদে প্রতিযোগিতা করে নি। রাজনীতির সাথে গ্রামবাসীদের সম্পর্ক শুধু ভোটের সময়। এছাড়া গ্রামের রাজনীতি কখনোই প্রাণ পায় না। নিম্নবিত্ত পরিবারের একজন সদস্য বশির আলী বলেন, "রাজনীতি বুঝি না। ওগুলান বড়লোকের ব্যাপার। ভোট চাইতে আইলে আমরা টাহা পয়সা দাবী করি পাই কিছু কিছু। ভোটের পর আর তেমন কোন সাড়াশব্দ- গ্রামে আহে না।" মূলত: গ্রামীণ রাজনীতির নিয়ন্ত্রকরা বসবাস করেন শহরে।। নির্বাচনের পূর্বে তারা ঘন ঘন গ্রামে যাতায়াত করেন। নির্বাচনের সময় সবদলই ভোট চায়। এ অবস্থায় সবচেয়ে সুবিধা ভোগ করে গ্রামের বেকার যুবক শ্রেণী। এ সময়কালে তারা দলাদলি, ক্যানভাস প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে টাকা পায়। ডিবুয়াপুর গ্রামে আওয়ামীলীগ, বিএনপি-র (গ্রামবাসীরা হাসিনা ও খালেদার দল বলে জানে) মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। তবে জিয়াউর রহমান ঐ অঞ্চলে বাঁধের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নত করেন বলে এলাকার লোকজন জিয়ার দলকে বেশী পছন্দ করেন। বর্তমানেও বিএনপি ইউনিয়ন পরিষদে ক্ষমতাসীন হয়ে আছে। জাতীয় পার্টির অস্তিত্ব বর্তমানে নড়বড়ে। এরশাদের পতনের পর জাতীয় পার্টি এ অঞ্চলে সাড়া জাগাতে পারে নি। ডিবুয়াপুর গ্রামে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, সংঘর্ষ, পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব, সংঘাত অধিকাংশ সময় দলীয় রাজনীতি পর্যন্ত গড়ায়। বিশেষত কর্মহীন বেকার শ্রেণীর লোকেরা গ্রামের এ সমস্ত সমস্যাকে বড় করে তোলেন। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দু'পক্ষ হয়ে প্রায়শই বিরোধ সৃষ্টি হয়। ডিবুয়াপুর গ্রামে মহিলাদের রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহ নেই। তবে অনেকে খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার নাম জানেন। খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার পোষ্টার নিয়ে কথা বলেছেন। আনোয়ারা খাতুন বলেন, "খালেদা জিয়া পর্দানশীল মহিলা। অনেক বড় ঘোমডা (ঘোমটা) দেয়। সুন্দর মুখটা ডাইক্কা রাহেন (ঢেকে রাখেন)। কিন্তু শেখ হাসিনার চুল দেহা যায়।" তবে এ ব্যাপারে শতকরা ১জন মহিলা কথা বলতে সক্ষম। রাজনেতিক ব্যাপার অনেকে বোঝেনই না। ভোট দিতে চান না অনেকেই। রাজনৈতিক বিষয়কে তারা দূরবর্তী কোন বিষয় বলে ভাবেন। তারা শহরের কোন রাজনীতিবিদ বা রাজনৈতিক দল গ্রামে দেখেননি কিংবা কেউ তাদের কোন উপকারও করেনি বলে জানায়। তবে নির্বাচনের সময় ভোট চাইতে আসে অনেকেই। এক্ষেত্রে গ্রাম্য ব্যক্তিদেরই তারা চেনেন।

১১। সমাজ

সমাজ হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা মোটামুটিভাবে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামেই সক্রিয়। গ্রাম গবেষণা থেকে জানা যায় যে, সমাজ হচ্ছে কিছু লোকের সংগঠন যার ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞাতি সম্পর্ক, যার নির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যার পরিচিতি আছে। হিন্দুদের মধ্যে গোত্র সমাজ হিসেবে পরিচিত। সাধারণত: গ্রামে অনেকগুলো সমাজ থাকে, একটি গ্রামে একটি সমাজ খুব কমই দেখা যায়। একটি সমাজ এক বা একাধিক গ্রাম নিয়ে হতে পারে। এর চরিত্র সাধারণত: একই ধরণের। সাধারণত: একটি সমাজ একটি গ্রাম এলাকা ছাড়িয়ে যায় না। অন্যদিকে একটি গ্রামের সীমারেখার ভেতর অনেকগুলো সমাজ বিরাজমান।[৭]

ডিবয়াপুর গ্রামে সমাজ বলতে সমগ্র গ্রাম, একটি পাড়া, একটি পরিবারের একই গ্রামে বসবাসরত জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে বোঝায়। ঐ গ্রামে সমাজের একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। গ্রামের লোকজন সমাজ এবং সামাজিক বিষয় নিয়ে সচেতন বলেই জানা গেছে কখনো সমগ্র গ্রামকে তারা সমাজ হিসেবে মনে করে, আবার শুধুমাত্র একটি পাড়ায় বসবাসরত নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীই হতে পারে, আবার একই গ্রামে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশী হলে তাদের নিয়েই সমাজ গঠিত হয়। গ্রামের বাইরের অন্য এলাকাকে তারা নিজেদের সমাজ বলে কখনোই মনে করে না। ডিবুয়াপুর গ্রামবাসী 'গৃহ'কে মনেকরেন পরিবারের অন্যতম ইউনিট হিসেবে। গৃহের ভিত্তি হচেছ একই 'উনুনে' যারা খাওয়া দাওয়া করে। বাড়ী বলতে বোঝায় একই আঙিনার মধ্যে বসবাসরত গৃহসমূহকে। গ্রামে প্রতিটি বাড়ীর আলাদা আলাদা নাম আছে। যেমন মৃধা বাড়ী, হাওলাদার বাড়ী সিকদার বাড়ী, আকন বাড়ী, কাজী বাড়ী, হাজী বাড়ী, তালুকদার বাড়ী, খাঁ বাড়ী, মাতবর বাড়ী, মোল্লা বাড়ী, মিয়া বাড়ী ইত্যাদি এর মধ্যে অর্থ এবঙ ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত বাড়ী গ্রামে ঐতিহ্যপূর্ণ ও বিখ্যাত।

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘদিন গ্রামে চেয়ারম্যান বা মাতবর হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করলে তারা মর্যাদাপূর্ণ হয়ে ওঠে। এছাড়া ঐ অঞ্চলের ঐতিহ্য অনুসারে 'বংশ' বাড়ীর খ্যাতির সঙ্গে জড়িত। যেমন পটুয়াখালী অঞ্চলে মিয়া, খাঁ, তালুকদার, সৈয়দ হচ্ছে আভিজাত্যের প্রতীক। এ সমস্ত বাড়ী তাই গ্রামবাসীদের কাছে বড়বাড়ী হিসেবে খ্যাত। গ্রামের বিচার-আচার, সালিশ, বিবাদ, বিপদে গ্রামের লোকজন এদের কাছে সাহায্য সহযোগিতার আশায় যায়। তবে সমাজে শ্রেণী বিভক্তির কারণে ধনী সমাজ, গরীব সমাজ বিভিন্ন ইস্যুতে ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন গরীব শ্রেণীর জনগণ তাদের সামাজিক, পারিবারিক ও অনুষ্ঠানাদিতে নিজেদের পর্যায়ভুক্ত পাড়াপ্রতিবেশী, পরিচিতজন এবং জ্ঞাতীগোষ্ঠী নিয়ে একত্রিত হয়। এক্ষেত্রে ধনী সমাজের কাউকে আমন্ত্রণ জানানো এবং তাদের আগমন ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর নির্ভর করে সংগঠিত হয়। কিন্তু ধনী সমাজের লোকজন অর্থ, সম্মান এবং মর্যাদার জোরে সমগ্র গ্রামের সমস্ত লোকজনকে সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে বিশাল খাওয়া দাওয়ার আয়োজন এবং কাপড়চোপড় প্রদান করে নিজস্ব প্রতিপত্তি প্রমান করে। এটি ঐ গ্রামে তাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

ডিবুয়াপুর গ্রাম চারটি পাড়ায় বিভক্ত পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিন পাড়া (গ্রামে পাড়া কান্দা হিসেবে পরিচিত) এক একটি পাড়ার নামকরা বাড়ী কিংবা ঐ পাড়ার বয়জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি পাড়ার লোকদের ভালমন্দ, ছোটখাট বিবাদ, সালিশ, পরামর্শ প্রদান প্রভৃতি পরিচালনা করেন। এ পাড়ার মধেকার বিষয় অন্য পাড়া পর্যন্ত গড়ায় না যদি না তা বড় কোন সংঘর্ষ, বিবাদ না হয়। বড়সড় ব্যপারে সমগ্র গ্রামই জড়িয়ে পড়ে।

গ্রামে প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিগন বিভিন্ন কারণে ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হন। বংশগত ঐতিহ্য, শিক্ষা, অর্থ, বর্ষীয়ান ব্যক্তি, রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি। স্কুল শিক্ষক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জ্ঞানী হিসেবে সমাদৃত হন। এছাড়া জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে ভাগাভাগির ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করা ক্ষমতা, জমি মাপার দক্ষতা, দলিলপত্র দেখার অভিজ্ঞতা প্রভৃতি কারণও এর পিছনে কাজ করে। গ্রামে লোকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে তারা সুবিচার না পেলেও এদের দ্বারস্থ হতে হয় এবং বিচার সালিশের মর্যাদা দিতে হয়, না হলে সমাজে বিভিন্ন কথা শুনতে হয়। গ্রামীণ সমাজে শ্রেণীভেদ কত প্রবল যে উঁচু পর্যায়ের ব্যক্তির সামনে গরীব শ্রেণীর লোকেরা দাঁড়িয়ে বা মাটিতে বসে কথা বলে। ধনী পরিবারের মহিলারা গরীব পরিবারের মহিলাদের সাথে পারতপক্ষে দূরত্ব বজায় রেখে চলে।

গ্রামীণ নারী

আমি এ অংশে ডিবুয়াপুর গ্রামের সমগ্র নারীদের সামগ্রিক জীবনধারার উপর সংক্ষিপ্ত আকারে আলোকপাত করেছি। নারীর গতিশীলতা, মূল্যবোধ কাজের ক্ষেত্র, পরিবারিক জীবনে অংশগ্রহণ, বিবাহ ও বিবাহত্তোর জীবন প্রভৃতি বিষয়াবলীর বিশদ ব্যাখ্যা করেছি। এ অংশে আমি আশার চল্লিশজন ভূমিহীন সমিতির নারীকে অন্তর্ভূক্ত করিনি। কারণ ঐ চল্লিশজন নারী বৈদেশিক সাহায্যের সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং এ সাহায্যের মাধ্যমে তাদের জীবনের কতটা পরিবর্তন সূচীত হয়েছে বা হয়নি তা পরবর্তী অধ্যায় তুলে ধরেছি। সমগ্র নারীর জীবনধারার মধ্য দিয়ে আমি ঐ গ্রামে নারীদের অবস্থান এবং কোন ধরণের পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আশার ভূমিহীন সমিতির সদস্যারা সংগঠিত হয়েছেন, ঋণ নিচ্ছেন তার একটি চিত্র পাওয়ার চেষ্টা করেছি। গ্রামীণ নারী সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি পরিবারগুলোর ধরণ চিহ্নিত করেছি। যেমন- নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত এবং বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করেনি এমন ছত্রিশটি ভূমিহীন পরিবারের নারীর জীবনধারা নিয়ে ব্যাখ্যা করেছি । নিম্নে তা বর্ণিত হ'ল-

গ্রামীণ নারীর জীবনধারা

১। নারীর চলাচলে সীমাবদ্ধতা

ডিবুয়াপুর গ্রামে একজন নারী বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বে এবং পিত্রালয়ে অবস্থানকালীন সময় বেশ কিছু স্বাধীনতা ভোগ করে। মহিলাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় পূর্বের তুলনায় ডিবুয়াপুর গ্রামে নারীর চলাচলের ক্ষেত্রে বেশ পরিবর্তন এসেছে। ১০/১২ বছর পূর্বে বার বছর বয়স হলেই মেয়েদের বাড়ীর বাইরে যাওয়া বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু বর্তমানে চৌদ্দ/পনর বছর বয়সের মেয়েরা বাড়ীর বাইরে চলাচল করতে পারে। অভিভাবকরা মেয়ের চলাচলের ব্যপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন। ঐ গ্রামে কাজ করাকালীন সময় বাড়ীর আঙিনার বাইরে কিংবা রাস্তায় পনের ষোল বছরের মেয়ে তেমন একটা চোখে পড়েনি। অভিভাবকরা মনে করেন চৌদ্দ বছর হলেই মেয়েদের বিয়ের বয়স হয়ে যায়। তখন বাড়ীর বাইরে ঘুরে বেড়ালে দুর্নাম হয়। এ নিয়ে বিয়ের সময় পাড়াপ্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনরা সমালোচনা করেন। এ সময় তাদের খালে বিলে, গ্রামের রাস্তায়, গরু চড়াতে কিংবা পাড়া প্রতিবেশীর বাড়ী না যাওয়াই ভাল। এটি ভূমিহীন, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত সব পরিবারের অভিভাবকরাই মেনে চলতে চান। তবে এক্ষেত্রে মধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীতে কড়াকড়ির বিষয়টি দৃঢ়। বাবা মা মনে করেন বিয়ের পর স্বামীর ঘরে মেয়েরা খেয়ালখুশীমত চলবে। তবে নারীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অনেকাংশে নির্ভর করে পারিবারিক অবস্থা, শিক্ষা, মর্যাদা, বয়স, পর্দা, বৈবাহিক অবস্থা ইত্যাদির উপর।

মোটামুটিভাবে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় চৌদ্দ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত একজন নারী গৃহের অভ্যন্তরেই জীবন কাটান। গ্রামীণ জীবনের অনেককিছু তার দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়। অভিভাবকরা সামাজিক কারণে কন্যা সন্তানদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করলেও বিবাহ পরবর্তীকালে সেক্ষেত্রে শৈথিল্য আসে। তবে শ্বশুরালয় নতুন বউয়ের জীবনে বেশ গতিবিধি আরোপ করা হয়। বিয়ের পর একজন পাঁচ 'ছ বছরের পূর্বে পাশ্ববর্তী বাড়ীতে বেড়াতে যায় না। সন্তানাদি ভূমিষ্ঠ হবার পর এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বেশ শিথিল হয়। বিশেষত নিম্নবিত্ত ভূমিহীন বা প্রায় ভূমিহীন পরিবারের নারীরা পরিবারের বিভিন্ন প্রয়োজনে বাড়ীর বাইরে যান। যেমন গরু ছাগল চড়ানো, খাদ্যসংগ্রহ, পানি আনা, ক্ষেতে ভাত নেয়া, মজুরী শ্রমিকের কাজ করা প্রভৃতি। তবে উচ্চবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীরা বাড়ীর আঙিনা ছেড়ে বাইরে যান কদাচিৎ। ধনী, গরীব নির্বিশেষে মাথায় কাপড় দিয়ে চলাচল করতেই হয়। আমি গ্রামে কাজ করার সময় বিষয়গুলো পর্যবেক্ষন করে এ ফলাফলই পেয়েছি।

ডিবুয়াপুর গ্রামের নারীরা ক্ষুদ্র গন্ডীতে জীবন যাপন করে। বিয়ের পর পিত্রালয় যেতে তাদের পরিবারের গৃহস্বামীর অনুমতি নিতে হয়। এটি সব পরিবারের বেলায় প্রযোজ্য। মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত পরিবারের নারীরা নিজস্ব চিকিৎসা কিংবা সন্তান সন্ততিরচিকিৎসার্থে বাড়ীর অনুমতিসাপেক্ষে শহরে যান। তবে একাকী নন। সংগে পুরুষরা কেউ থাকেন। শ্বশুরালয় থেকে পিতার বাড়ীতে এলে মেয়েরা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে। পিতামাতাও পূর্বের মত নিয়ন্ত্রণ করে না। একজন নারী তখন পাড়া প্রতিবেশীর বাড়ী, এপাড়া ওপাড়া করতে পারে।

একটি বিষয় এক্ষেত্রে উল্লেখ্য কোন মেয়ে কোন কারণে (যৌতুক বা অন্য যে কোন সমস্যা) শ্বশুর বাড়ী থেকে পিত্রালয় ফেরৎ পাঠালে তখন সেই মেয়ের চলাচলে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রে মেয়েকে সংযমী হয়ে চলতে হয়। বাড়ীর বাইরে কিংবা পাড়াপ্রতিবেশীর বাড়ীতেও যেতে দেয়া হয় না। কারণ মেয়ে ফেরৎ আসার জন্য সমাজের লোক বিভিন্ন ধরণের সমালোচনা করে। তাছাড়া শ্বশুরবাড়ীতে মেয়ের সম্পর্কে কোন কথা পৌঁছলে তারা পরবর্তীতে তাদের বউ ঘরে নিতে চাইবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ডিবুয়াপুর গ্রামের আবদুল হক ও রিজিয়া বেগমের মেয়ে মেট্রিক পাশ করেছে। তার বিয়ে দেয়া হয়েছে পার্শ্ববর্তী গ্রামে। কিন্তু চাহিদামত যৌতুক দিতে না পারায় মেয়েকে পিত্রালয় পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে তাকে খুব সংযমী হয়ে চলতে হয়। আমি তাকে বাড়ীর মধ্যেও সর্বদা মাথায় কাপড় দিয়ে চলাচল করতে দেখেছি। যদিও মেয়েটি

Dhaka University Institutional Repository

চাকুরী করতে চায় কিন্তু তার বাবা মা অনুমতি দিচ্ছে না। কারণ শ্বশুরালয়ে থেকে চাকরীর ব্যাপারে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে তাহলে যৌতুক পেলেও তারা মেয়েকে ঘরে তুলবে না।
ডিবুয়াপুর গ্রামের পশ্চিম পাড়ার নারীরা পূর্ব পাড়ার নারীদের চিনেন না। কারণ বিয়ের পর তারা বাড়ী থেকে বের হননি তেমন একটা।

২। নারী শিক্ষা ঃ

ডিবুয়াপুর গ্রামে নারী শিক্ষার হার ৩১.৭৭%। গ্রামের অভিভাবকগণ তাদের কন্যাসন্তানদের শিক্ষার বিষয় যথেষ্ট আগ্রহী না হলেও পঞ্চম কিংবা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াতে অনেকেই অমত পোষণ করেন না। এর আরও একটি কারণ আছে তা হ'ল গ্রামে একটি প্রাইমারী স্কুল ও একটি হাইস্কুল রয়েছে। প্রাইমারী স্কুলে পড়াশোনার মান একবারে নিম্নমানের নয়। গ্রামের অভিভাককদের নিকট থেকে তথ্যে জানা যায় প্রাইমারী স্কুলে তারা তৃতীয় বা চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠাতে (সবাই এ ব্যাপারে একমত নন) চান, এক্ষেত্রে স্কুলের বেতনের বিষয়টি না থাকলেও কাগজ কালি কাপড় চোপড়ের জন্য খরচ করতে হয়। সে সামর্থ সবার নেই। আবার অভিভাবকরা কন্যাসন্তান পাত্রস্থ করতে পারলে লেখাপড়ার বিষয়টি গুরুত্ব দেন না। কারণ গ্রামে চৌদ্দ বছর বয়স থেকে বিয়ে দেয়ার নিয়ম রয়েছে। আরও একটি বিষয় রয়েছে যা নারী শিক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করছে সেটি হল গ্রামের হাইস্কুলটি কো-এডুকেশন। গ্রাম থেকে শহরের স্কুলের দূরত্বও অনেক। মেয়েদের শহরের স্কুলে পাঠাতে অনেকেরই আপত্তি আছে। তাই দেখা গেছে পঞ্চম শ্রেণীর পর নারী শিক্ষার হার হ্রাস পেতে শুরু করে। উচ্চবিত্ত পরিবারের অভিভাবকরা এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। বিশেষত পুরুষ অভিভাবকরা মনে করেন মেয়েরা বেশী পড়াশুনা করলে স্বামী কিংবা বাবা মার উপর শ্রদ্ধবোধ থাকে না। তাই মহিলাদের ইচ্ছা থাকলেও বেশী পড়ালেখা করা সম্ভব হয় না। ডিবুয়াপুর গ্রামে মেয়েদের পড়ালেখার ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ভূমিহীন পরিবারগুলোই অগ্রগামী। মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত অনেকে পড়ান। তারপরও বিভিন্ন পরিবারের তথ্যানুসারে দেখো গেছে ৭/৮ বছরের একটি মেয়ে ছোট ভাইবোনের দেখাশোনা, পরিচর্যার কাজ করে থাকে। মা গৃহের কাজে ব্যস্ত থাকলে ছোট ভাইবোনের দায়িত্ব কন্যাসন্তানকেই বহন করতে হয়। এভাবে জীবনের আসল সময় অভিভাককদের অসচেতনতার অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। আবার গ্রামের শিক্ষিত মেয়েরা ভালভাবে কথাবার্তা বলতে পারে বলে নিজশ্রেণীর অশিক্ষিত মহিলারা তা নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে।

নিম্নে সারনীর মাধ্যমে ডিবুয়াপুর গ্রামের না;রী শিক্ষার হার তুলে ধরা হল-

সারণী - ১০

শ্রেণী	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
কেবলমাত্র লিখতে পারে	৪০	৬.২৫%
I - V	১০০	১৫.৬৪%
VI - VII	৪৫	৭.০৪%
XI - X	১০	১.৫৬%
মাধ্যমিক	৫	০.৭৮%
আই এ	৩	০.৪৬%
বি এ	X	-
নিরক্ষর	৩০০	৪৬.৯৪%
অপ্রাপ্ত বয়স্ক	১০৬	১৬.৫৮%
	৬৩৯	

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে পঞ্চম শ্রেণীর পর থেকে শিক্ষার হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে এবং পরবর্তীতে আই,এ তে এসে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়ে ০.০৪৬% এ দাঁড়িয়েছে। কেবলমাত্র নাম লিখতে পারে যে ৪০ জন তারা আশার ভূমিহীন সমিতির সদস্য।

৩। **বিয়ে এবং নারী ঃ নারীর বিয়ে পূর্ব জীবন**

ডিবুয়াপুর গ্রামে মেয়ের বিয়ে এবং যথার্থ বয়স পেরোবার আগে পাত্রস্থ করাই বাবা ও মা উভয়ের মৌলিক চিন্তা। একটি মেয়ে রান্নাবান্না, সেলাই, শিক্ষাদীক্ষায় দক্ষতা অর্জন করলেও তার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত অভিভাবকরা মানসিক দুশ্চিন্তায় ভোগেন। স্বামীর ঘর, সংসার, সন্তান উৎপাদান এবং শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সেবাযত্ন এ কয়টি তাদের কাছে মূখ্য বিষয়। ডিবুয়াপুর গ্রামে জরীপ করতে গিয়ে দেখেছি যার ঘরে বিবাহযোগ্য কন্যা সেই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ কিংবা বিবাহযোগ্য হবার পূর্বেই মেয়েকে নিয়ে তারা দুশ্চিন্তায় থাকেন। তবে গ্রামে মেয়ের বিয়ের বয়সের ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। যেমন উত্তর পাড়ার মোমেনা খাতুন (৬০) জানান তার বিয়ে হয়েছিল ৭ বৎসর বয়সে। ৩০/৪০ বছর পূর্বে ৬/৭ বছর বয়সের মেয়েকে পাত্রস্থ করা হত। বর্তমানে ১২ বৎসর বয়স থেকে বিয়ের ভাবনা শুরু হয়। তবে ১৪ বৎসর বয়সের বেশী বড় মেয়ে কেউ ঘরে রাখতে চান না। যদিও ডিবুয়াপুর গ্রামে ১৪ বৎসরের উর্দ্ধে বয়সী কন্যা অনেকের ঘরেই আছে। এটি গ্রামে বিরাট সমস্যা। কারণ বয়সী কন্যার অভিভাবকদের গ্রামের লোকের কথা শুনতে হয়। মেয়েটিও 'আইবুড়ো' নামে পরিচিত হয়। এতে ২/১ জন অভিভাবকের ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন দেখা গেছে যেমন ধলু মুন্সীর বাড়ীর আবদুল হক হাওলাদার বলেন "মেয়ে বিয়ে দিতে হবে বলে তাকে হাত পা বেঁধে পানিতে ফেলে দেয়া যাবে না, চেষ্টা করবো যখন হবার তখন হবেই।"

৪। **বিয়ের বয়স ও পারিবারিক মর্যাদা ঃ**

নারীর বিয়ের বয়সের সাথে পারিবারিক মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক বিষয়টিও জড়িত। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং মর্যাদাবান পরিবারে দশ বছর বয়স থেকেই মেয়ের বিয়ের সম্ভাবনা তৈরী হয়। কারণ বেশী বয়সের মেয়ে ঘরে অবস্থান করলে পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। অনেকে মনে করেন মেয়ের যথেষ্ট শারীরিক ও মানসিক ত্রুটির কারণেই মেয়ের বিয়ে দেরীতে হয়। উচ্চবিত্ত পরিবারের গৃহকর্তা আব্দুর রব ও তার গৃহিনী সাফিয়া বেগম মনে করেন একটি মেয়ে আরবী পড়া শিখে, ২/৩ ক্লাস বাংলা পড়তে পারলেই (না পারলেও অসুবিধা নেই) বিয়ে দিয়ে দেয়া উচিত। তাছাড়া এসব পরিবারের মেয়েদের সম্বন্ধও আসে তাড়াতাড়ি। মেয়েকে যোগ্য পাত্রের হাতে তুলে দেয়াটাকে তারা ধর্মীয় দায়িত্ব বলেও মনে করেন। এক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা কিছুটা সময় হাতে পান। যেমন এসব পরিবারে সাধারণতঃ ১৪ বসর বয়সে বিয়ে দেয়া হয় কখনো ১৬ বৎসরও হয়ে যায়। এরা অনেকে সপ্তম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পান। যেমন রওশন আরা, রাহিমা, সাহানা সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী পাশ করে শ্বশুর বাড়ী গেছেন। নিম্নবিত্ত এবং ভূমিহীন পরিবারে বিয়েটাই মূখ্য এবং তারা ১২ বৎসর বয়স থেকে মেয়ের বিয়ে দিতে চান। কোনরকম খেয়েদেয়ে চলতে পারে এমন ছেলে পেলেই তারা সন্তুষ্ট। অনেক সময় ১২ বৎসরের একটি মেয়ের ৩০ বছরের পুরুষের সাথে বিয়ে হয়। পশ্চিম পাড়ার শেফালী নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে তার বর্তমান বয়স ১৪ এবং স্বামীর বয়স ৩০/৩১ বছর হবে। তাদের বিয়ে হয়েছে দু বৎসর গত হয়েছে।

৫। **বিয়ে এবং যৌতুক সমস্যা ঃ**

ডিবুয়াপুর গ্রামে মেয়ের বিয়ের সাথে যৌতুক একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেয়াটা যেমন অপরিহার্য ছেলের বিয়েতে যৌতুক দাবী করাটাও তেমনি ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করা হয়। এজন্য মেয়ে বাড়তি সমস্যা। মেয়ের জন্য পুঁজি করতে হয় আর ছেলের মাধ্যমে পুঁজি আসে। যৌতুকের ব্যপারে গ্রামবাসীদের সংগে আলাপ করে দেখেছি যৌতুক দেয়াটা যেমন সমস্যা তেমনি একটি স্বাভাবিক ঘটনা। গ্রামের নারী এবং পুরুষ

উভয়ই সবিস্ময়ে বলেন, "যৌতুক আবার কে না দেয়- এটা তো না দিয়ে উপায় নেই।" রোকেয়া বেগম (দক্ষিণ পাড়ার মৃধা বাড়ী) বলেন, "যৌতুকের কারণে বিয়ে দেবার পরও মেয়ে ঘরে ফেরৎ আসে না দিয়ে উপায় কি?" আমি কয়েকজনকে এর বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলতে তারা কেমন ব্যাঙ্গের সুরে হেসে উঠল এবং বলল, "আপা এই গ্রামে বহু যুগ ধরে যৌতুক দেয়া নেয়া হচ্ছে। মেয়ের বাবা যৌতুক দিয়ে বিয়ে দিতে না পারলে সমাজে মেয়ে এবং পরিবারের দুর্নাম হয়। এটা আমাদের জন্য দৈনন্দিন সমস্যা।" যৌতুকের কারণে ডিবুয়াপুর গ্রামে নিম্নবিত্ত, ভূমিহীন পরিবারগুলো যেমন মেয়ের বিয়ে দিতে এবং দেয়ার পরও সমস্যায় পতিত হয় তেমনি মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারগুলো যথেষ্ট যৌতুক দিয়েই মেয়েকে পাত্রস্থ করেন। নিম্নে পরিবারভেদে যৌতুকের পরিমাণ ব্যাখ্যা করা হ'ল-

ক. নিম্নবিত্ত পরিবার ও যৌতুক ঃ

একটি নিম্নবিত্ত পরিবার যারা কোনরকম ১ বা ২ বেলা খেয়ে জীবনধারণ করেন তাদের ক্ষেত্রে মেয়েকে নাকফুল, রূপার একজোড়া দুল, দুটা শাড়ী ব্লাউজ, পেটি কোট, ছেলের রেডিও, ঘড়ি, সাইকেল, কাপড়চোপড়, নগদ পাঁচ হাজার টাকা এবং কমপক্ষে ১০ জন বরযাত্রী আপ্যায়ন করতে হয়। এতে ঐ পরিবারের অভিভাবককে নিম্নতম দশ/বার হাজার টাকা যোগাড় করতে হয়। এটি ঐ পরিবারের জন্য একটি দু:সাধ্য ব্যাপার হলেও করতে হয় আর না করতে পারলে দুর্ভোগের শিকার হয় ঐ পরিবারটি।

খ. ভূমিহীন পরিবার ঃ

ভূমিহীন পরিবারের এর ব্যতিক্রম নেই। পিতার ভিটেবাড়ী না থাকলেও কন্যাকে কিছু দিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে মেয়ে সুন্দরী হলে যৌতুক কিছুটা শিথিলযোগ্য হয়। নিদেনপক্ষে ঐ পরিবারের কন্যা পাত্রস্থ করতে নাকফুল, ১টি পরিধেয় কাপড়, ছেলের ঘড়ি, পাজামা, পাঞ্জাবী এবং মাংস-ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় বিয়ের পর যৌতুকের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পায় হয়ত ছেলেপক্ষ একটি সাইকেল চেয়ে বসে এবং সেটি দিতে না পারলে মেয়ের উপর নির্যাতন শুরু হয়। এমনকি তাকে ফেরৎ পাঠানো হয় বাবার বাড়ীতে।

গ. মধ্যবিত্ত পরিবার ও যৌতুকের পরিমাণ ঃ

মধ্যবিত্ত পরিবারেরও যৌতুক দেয়াটা সমস্যার বিষয়। কারণ হয়ত এক পরিবারে চারটি কন্যাসন্তান রয়েছে। সেক্ষেত্রে চারজনকে পাত্রস্থ করতে পিতার জমিজমা হাতছাড়া হয়ে যায়। কারণ হয়ত ঐ পরিবারে আয়ের একমাত্র উৎস জমি। তদুপরি রয়েছে পরিবারের মানমর্যাদা। সুতরাং কন্যার বিয়েতে যৌতুক তার জন্যও সম্মান বয়ে নিয়ে যায় এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারে। এক্ষেত্রে দেখা যায়- মেয়ের দুটো গহনা (হাত ও কানে কমপক্ষে ২ ভরি), শাড়ী, তৈজসপত্র, ছেলের ঘড়ি, আংটি, ক্যাসেট প্লেয়ার, নগদ ২০/৩০ হাজার টাকা দিতে হয়। আর ছেলে যদি সুশিক্ষিত ও ভাল চাকুরী করে তবে পাত্রপক্ষের ডিমান্ড আরও বেড়ে যায়। দেখা যায় ছেলে শহরে বাস করছে সুতরাং একটি টিভি কিংবা হোন্ডাও যোগ হয় এর সাথে। তদুপরি রয়েছে যথার্থ আপ্যায়নের ব্যবস্থা। খাদ্যের ক্ষেত্রে পোলাও, মাংস, মিষ্টি অপরিহার্য।

ঘ. উচ্চবিত্ত পরিবার ও যৌতুক ঃ

উচ্চবিত্ত পরিবারের অভিভাবকরা ধরেই নেন পাত্র পক্ষকে বিনা যৌতুকে সন্তুষ্ট করা যাবে না। কারণ তার সম্পদ আছে বলেই মেয়ের বহু সম্বন্ধ আসে। এ কারণে অনেক সময় দেখা যায় গরীবের ঘরের উচ্চ শিক্ষিত ছেলে উচ্চবিত্ত পরিবারের অভিভাবকরা যৌতুকের মাধ্যমে পেয়ে যান। শর্ত থাকে ছেলেকে বিদেশে চাকুরীর জন্য পাঠাতে হবে কিংবা ব্যবসা বাণিজ্য করার পর্যাপ্ত টাকা দিতে হবে। সাথে আনুষঙ্গিক অন্যান্য যৌতুক তো

Dhaka University Institutional Repository

আছেই। উচ্চবিত্ত পরিবারে সাধারণতঃ মেয়ের সমস্ত গহনা, কাপড় চোপড়, আসবাবপত্র (গ্রাম হলে গ্রামের উপযোগী, শহরে বিয়ে হলে সে উপযোগী), নিত্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রাদি, ছেলের ঘড়ি, আংটি, স্যুট অথবা দামী কাপড়, রেডিও, ক্যাসেট প্লেয়ার- অপরহার্য সাথে নগদ টাকা তো থাকেই (৫০/৬০ হাজার)।

যৌতুক যে একটি সমস্যা এবং এর সমাধান হওয়া উচিত এ নিয়ে গ্রামবাসীর কোন আকাংখা নেই। তাদের ভাষায় এসব সমস্যার সমাধান সরকার করবে তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। গ্রামে যৌতুক বিরোধী কোন বক্তব্য নেই। তবে সবাই বোঝে যৌতুক না দিতে পারলে ভাল হত।

৬। বিবাহ পরবর্তী নারীর জীনবধারা ও নির্যাতনী সমস্যা ঃ

ডিবুয়াপুর গ্রামে সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় বিবাহ পরবর্তী জীবনে নারীর জীবনধারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। একটি ১৩/১৪ বছরের কিশোরী রাতারাতি বয়সী নারীর ভূমিকায় চলে আসে। পিতার সংসারে যে মেয়েটিকে পরিবারের দায়িত্ব ও চাপ সহ্য করতে হয়নি শ্বশুরালয়ে তাকেই একটি বিশাল সংসারের দায়িত্ব বুঝে নিতে হয়। তার জীবনে বাধা বন্ধন, নিয়ম কানুন, প্রথা, ধর্মীয় রীতি নীতির আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা পড়ে যায়। এক্ষেত্রে ঐ গ্রামের ধনী, দরিদ্র ভেদে সব পরিবারের চরিত্র এক। এটি ওখানকার সামাজিক মূল্যবোধ। বিয়ে পরবর্তীকালে দুটো জিনিষ তার উপর বর্তায় ঃ-

১. পরিবারের পরিশ্রমের বোঝা,
২. সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি।

অন্যদিকে নির্যাতনের বিষয়টিকেও বাদ দেয়া যায় না। এক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক দুটো নির্যাতনী প্রক্রিয়াই ক্রিয়াশীল। একটি মেয়ে স্বামীর ঘরে যাবার পর পুরো পরিবারটি কিংবা স্বামী তার অচেনা। এ অচেনা বলয়ে শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, দেবর, ননদ, জা, ভাসুর কেউ তাকে আপন করে নেয় না। তার প্রতিটি কাজের অক্ষমতার জন্য দোষারোপ করা হয় কিংবা বলা হয় মা কেন তাকে কিছু শিক্ষা দেয়নি। সিকদার বাড়ীর রওশন আরা বলেছে "আপা শ্বশুরবাড়ী গিয়ে আমার মনে হয়েছিল সংসারের সবার সেবাযত্ন করার জন্যই আমি গিয়েছি। তের বৎসর বয়সে আমাকে রেধে বেড়ে সবাইকে খাওয়াতে হত। এমনকি ছোট ননদ দেবরের ফরমায়েশও আমার শুনতে হত। কখনো পারবো না বললে শ্বাশুড়ী অকথ্য ভাষায় গালামন্দ করত। খেতে দিত না।" বউয়ের আচরণ চলা ফেরা সব কিছুর মধ্যেই ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো যেন তাদের অভ্যাস। স্বামীর কাছে শ্বাশুড়ী বা শ্বশুর কর্তৃক নালিশ এবং মারধোর করাটা গ্রামীণ সমাজে একটি অভ্যাসের মত। অনেক তুচ্ছ কারণে নারীকে স্বামীর গঞ্জনা সইতে হয়। যেমন দেরীতে রান্না হওয়া, খাবার কম পড়া, রান্না খারাপ হওয়া, প্রতিবাদ করলে, কোন পর পুরুষের সঙ্গে কথা বললে, সন্তানের অন্যায়কে মায়ের অন্যায় হিসেবে গন্য করা বার বার কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া এসমস্ত কারণে নারীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়। সবচেয়ে বেশী নির্যাতন করা হয় মেয়ের বাবা মা এর যৌতুক দিতে না পারার কারণে। যৌতুকের কারণে নির্যাতিতা হয়ে পিত্রালয়ে ফেরৎ এসেছে একরম পাঁচজন তরুনীর সংগে কথা বলেছি। রাশিদার বাবা নেই। মা খুব কষ্ট করে জমি বেচে চারহাজার টাকা যোগাড় করে তার বিয়ে দিয়েছিল পার্শ্ববর্তী সারিকখালী গ্রামে, কিন্তু প্রথম বছরই সে ৯ মাস ঘর করার পর ফেরৎ আসে। তাকে জানানো হয় তার মায়ের কাছ থেকে আরও তিন হাজার টাকা নিয়ে আসতে। তখন সে ৫ মাসের অন্তঃসত্তা। সে জানাল স্বামী এবং শাশুড়ী তাকে প্রায়ই মারত এবং মৃত বাবাকে বকাঝকা করত। অন্তঃসত্তা অবস্থায় যে একজন নারীকে নির্যাতন করতে হয় না এবং বাবার বাড়ীতেও ফেরৎ পাঠাতে হয় না এটা তারা মানেন না। আমি জানতে চেয়েছিলাম মারার জন্য তারা কি হাতিয়ার ব্যবহার করত? বাঁশের লাঠি, বাতি রাখার ষ্ট্যান্ড (দৈউরহা), ঝাড়ু, হাত এবং পাদুটোই। নির্যাতন সম্পর্কে সাধারণ নারীর বক্তব্য হ'ল "বাবা মা দিতে পারলে তো স্বামীর ঘর করতে পারত। দরিদ্র নারীরই জীবনে সমস্যা বেশী। আর পুরুষ মানুষের রাগ তো থাকবেই। তারা মাঠে ঘাটে কাজ করে। স্বামী মারলে কি করার আছে? আইন আদালতের আমরা কি বুঝি?"

নির্যাতনের আরও একটি দিক রয়েছে। যেমন পুরুষ দ্বিতীয় বিয়ে করতে চাইলে যদি স্ত্রী দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ডিবুয়াপুর গ্রামে মহিলাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় বিনা কারণেই পুরুষরা বিয়ে করতে চায়। পুরুষের হাতে অর্থের সমাগম ঘটলে তারা বিয়ে করে কিংবা হাটে বাজারে গিয়ে অযথা খরচ করে। এ সম্পর্কে উচ্চবিত্ত পরিবারের পুরুষরা ঘরে দু/তিন স্ত্রী থাকা পছন্দনীয় বলে মনেকরেন। আবার স্ত্রী ২/৩ বছর সন্তান না হলেই পুরুষরা পুনরায় বিয়ে করেন।

৭। মাতৃত্ব এবং নির্যাতন ঃ

ডিবুয়াপুর গ্রামে বিভিন্ন বাড়ীতে ঘুরতে গিয়ে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে সন্তান লালন, পালন, সেবাযত্ন নারীকে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হয় কিন্তু সন্তানের জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর কোন অধিকার নেই। কোন কোন বাড়ীতে ঢুকে শুনেছি স্বামী চিৎকার করে বলছে "তোর জন্য ছেলে এত সাহস পেয়েছে। বেয়াড়া হয়ে গেছে। ছেলে মেয়ে সামলাতে পারিস না তো সংসার করিস কেন? ভাল মায়ের সন্তান ভাল হয়। তুই ভাল নস তোর সন্তান ভাল হবে কেন।" এছাড়া সন্তান বারবার অসুস্থ হলে মাকে কথা শুনতে হয়। অর্থাৎ মা যত্ন নেয় না তাই এমন হয়। মা অনেক সময় সংসারের কাজেই সন্তানের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না অথবা পর্যাপ্ত খাবারের অভাবে সন্তানের সুস্থতা বিঘ্নিত হয় কিন্তু এটা স্বামী কিংবা শ্বশুড় কুলের কেউ মানতে রাজী নন। তারা দোষারোপ করেন নারীকে। ভূমিহীন পরিবারের সুফিয়ার খুব সখ তার ছেলে স্কুলে পড়বে কিন্তু স্বামী তার তোয়াক্কা না করে তাকে মসজিদে দিয়ে এসেছে। কারণ ওখানেই সে থাকবে, খাবে, পড়বে। তার ভরণ পোষণের চিন্তা তাকে করতে হবে না। এক্ষেত্রে তার স্বামীর বক্তব্য হ'ল ছেলে আমার যা করার আমিই করবো।" উচ্চবিত্ত পরিবারে সন্তানরা বাবার সিদ্ধান্তে বড় হতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে কারণ তারা দেখে অর্থ এবং ক্ষমতা দুটোই পিতার হাতে। মা নিমিত্ত মাত্র সন্তানের সামনে মাকে নির্যাতনও এর একটি কারণ। পূর্বে বর্ণিত রাবেয়া বেগমের বক্তব্যই তার প্রমাণ। এছাড়া যে ঘটনাটি নারীকে পরিবার ও সমাজে সবচেয়ে বেশী ছোট করে সেটা হ'ল তার বন্ধ্যাত্ব।

৮। পর্দা এবং নারীর জীবনে ক্রিয়াশীলতা ঃ

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পর্দার বোধ এবং ধারণা গ্রাম ও শহর উভয়ক্ষেত্রেই বিভিন্নভাবে ক্রিয়াশীল। এটি নির্ভর করে পারিবারিক মর্যাদা, ধরণ, শিক্ষা, বংশগত ঐতিহ্য, পারিার্শ্বিক অবস্থা। সামাজিক পরিবর্তন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর। পাপানেকের উক্তি অনুসারে বলা যায়, Purdah system is related to status, the division of labour, interpersonal dependency and social distance and the maintence of moral standards as specified by society. [৮] "নারী পুরুষের মধ্যে পৃথকীকরণে শক্তিশালী করার একটা বড় মাধ্যম হচ্ছে পর্দা" এর ব্যাপকতা ধর্ম যেমন তেমনি সামাজিক প্রথার মধ্যে ছড়ানো রয়েছে।"[৯]

ডিবুয়াপুর গ্রামের প্রেক্ষিতকে সে দৃষ্টিকোনথেকে বলা যায় পর্দার সংগে নারীর সম্পর্ক ধর্ম এবং সামাজিক প্রথা দুটোর মধ্যেই অন্তর্গত। মহিলারা পর্দার বিষয় যেমন পাপ পূণ্য বোধে উজ্জীবিত তেমনি সামজিক দুর্নামের ভয়ও করেন। গ্রামের পথে বয়স্ক নারীদের মাথার ঘোমটা কিংবা বোরখা ছাড়া দেখা যায়নি। ১৪/১৫ বছরের স্কুলগামী মেয়েদেরও অন্তত একটি ওড়না থাকে মাথায় দেয়ার জন্য। গ্রামের মহিলারা পর্দানশীল নারীর সুখ্যাতি ও সম্মান করেন। পর্দার বিষয়টি নারী পারিবারিক পরিসর থেকেই জ্ঞাত হয়। পর্দা মেনে চললে আল্লাহ্‌র পথে চলা হয় এ বোধ নারীদের মধ্যে ক্রিয়াশীল।

ডিবুয়াপুর গ্রামে পর্দা ব্যবহারের ক্ষেত্রে শ্রেণীর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আমি তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখেছি পর্দার বিষয়টি উচ্চবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত পরিবার যতটা দৃঢ়তার সংগে মেনে চলেন নিম্নবিত্ত বা ভূমিহীন পরিবার গুলো ততটা দৃঢ়তার সংগে মেনে চলতে সক্ষম হন না। উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক

Dhaka University Institutional Repository

নারীরাই দরিদ্র মহিলাদের সমিতি করা কিংবা রাস্তাঘাটে কাজ করার সমলোচনা করেন। কয়েকটি বাড়ীতে মহিলারা আমার সারা গ্রামময় একাকী ঘুরে বেড়ানো নিয়ে নানা প্রশ্নও করেছে। পরবর্তীতে বলেছে গ্রামের কাজ করার সময় মাথায় কাপড় দিয়ে চলতে। ভূমিহীন পরিবারগুলো ক্ষেত্রে আবার এ নিয়ে কোন মন্তব্য শুনতে হয়নি।

উচ্চবিত্ত পরিবারের নারীরা দিনের বেলায় বাড়ীর বাইরে বের হন না। শ্বশুর, স্বামী এদের সামনে ঘোমটা দিয়ে চলেন। ভাসুর, মামাশ্বশুর, এধরণের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঘোমটা দিয়ে দাড়িয়ে কথা বলেন।

মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীরা বাড়ীর আঙিনার বাইরে দিনের বেলায় চলাচল না করলেও বাড়ীর মধ্যে শিথিলভাবে চলাচল করেন। পুরুষের অনুমতি ব্যতিরেকে তারা বাড়ীর বাইরে যান না। আত্মীয় স্বজনের সংগে কথোপকথনের সময় মাথায় ঘোমটা থাকতে হয়। অচেনা এবং অনাত্মীয় পুরুষের সামনে এরা একেবারে যান না।

নিম্নবিত্ত পরিবারের নারীদের সংসারের যাবতীয় কাজ নিজের হাতে করতে হয় বলে গৃহের অভ্যন্তরে সবসময় থাকা সম্ভবপর নয়। তবে মাথায় কাপড় দিয়ে শালীনতা বজায় রাখা এবং বিনা প্রয়োজনে কোনও পুরুষের সাথে কথোপকথন করাটা পরিবারে ভাল বলে মনে করা হয় না। দেখা গেছে বাড়ীর আঙিনার বাইরে পুকুরে পানি আনতে গেলে কিংবা গরু চড়াতে গেলে অন্য পুরুষ দেখলে মহিলারা বড় ঘোমটা দিয়ে উল্টাদিকে মুখ করে কিংবা গাছের আড়ালে দাড়ান।

ভূমিহীন পরিবারের নারীকে কাজের তাগিদে গ্রামের বিভিন্ন বাড়ীতে যেতে হয়। ভিক্ষা করতে বের হতে হয়। সেক্ষেত্রেও মাথায় কাপড় দিয়ে চলতে হয়। অসংলগ্নভাবে চলাফেরা করলে গ্রামীণ মহিলাদের দ্বারাই সমালোচিত হতে হয়। পরিবারে আর্থিক অনটনের কারণে একজন মহিলা ব্লাউজ কিংবা পেটিকোট পরিধান করতে পারেন না কিংবা ছেঁড়া শাড়ী পড়তে হয় কিন্তু তাকে মাথায় কাপড় রেখে চলতে হয়। পর্দার ব্যাপারে এরা নিজেরাও সচেতন। ধর্মীয় ভীতি তো আছেই সামাজিক ভীতিও সে অপেক্ষা কম নেই। তবে স্বামী শ্বশুর কিংবা ভাসুর সম্পর্কীয় লোকের কাছে এদের মাথায় কাপড় বা পর্দার রক্ষার বিষয়টি যথেষ্ট শিথিল।

৯। পেশাগত অবস্থা ঃ

ডিবুয়াপুর গ্রামে পেশাগত দিক থেকে পুরুষ প্রাধান্য বিদ্যমান। পুরুষ পারিশ্রমিক নিয়ে সর্বত্র কাজ করার সুযোগ পেলেও (যদিও একজন দরিদ্র দিনমজুর ধনী শ্রেণীর কাছ থেকে প্রাপ্য আদায় করতে পারছে না) নারীর ক্ষেত্রে এ ধরণের সুবিধা খুব কম। ডিবুয়াপুর গ্রামে কেবলমাত্র ভূমিহীন পরিবারের নারীরাই অন্য বাড়ীতে কাজ করতে যায় কিংবা মাটি কাটে। কারণ আশার কর্মী কিংবা গ্রামীণ ব্যাংক ব্রাক বা কেয়ারের কর্মীরা ঐ গ্রামের কোন মহিলা নন। গ্রামের পুরুষরা ক্ষেত কামলা, যোগানদার, ঘরামি, ধান কাটা ও তোলার সহযোগী, নৌকার মাঝি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছেন এবং মজুরীও পাচ্ছেন কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে বৈষম্য বিদ্যমান। যেমনি ধান ওঠার সময় নারী শ্রমিক একটি বাড়ীতে ধানসিদ্ধ, শুকানো, ধান বাড়া বাবদ দশ কিংবা পনের দিন ৫/৬ কেজি চাল ও প্রতিদিন দুপুরে একবেলা খাবার পায়। কাজের সময়কাল যত দীর্ঘ হয় তার সাথে ধান কিংবা চালের পরিমাণও ঐ হারে বৃদ্ধি পায়। একজন পুরুষের ক্ষেত্রে কেবল ধানমাড়াই করে একদিনে পায় ২ বেলা খাবার ও আধাকেজি চালের দাম। আর মাঠে কামলার কাজ করলে ২ বেলা খাবার এবং মাসশেষে ১৫ কেজি চাল কিংবা মালিক ভাল হলে ২০ কেজি চাল। আর কোন বাড়ীতে বছরব্যাপী ঠিকে কাজ করলে একজন নারী তিনবেলা খাবার ও বছরে দুটি পরিধেয় কাপড় পায়। (ঈদ কিংবা কোরবানী) অন্যদিকে একজন পুরুষ তিনবেলা খাবার, মাসিক বেতন ও বাৎসরিক কাপড় পায়।

ডিবুয়াপুর গ্রামে হাজীবাড়ীর আলেয়া বেগমের কথা এ প্রসংগে উল্লেখ করা হ'ল। আলেয়া বেগম জানাল তার দরিদ্র পরিবারে সে হাঁস মুরগী পালন করে এর ডিম ও বাচ্চা বাজারে বিক্রীর জন্য পাঠায়। যেহেতু শহরের

বাজারে সেগুলো পাঠাতে হয় সুতরাং তাকে নির্ভর করতে হয় স্বামীর উপর। সে জানাল সঠিক হিসাব কখনো পায় না কিংবা বিক্রীর প্রাপ্ত টাকা স্বামী কোনও অপ্রয়োজনীয় খাতে খরচ করে ফেলেছে। যেহেতু এগুলো ফেরি করবার স্বাধীনতাটুকু তার নেই কারণ এতে তার স্বামীর পরিবার এবং গ্রামের লোকজন বাধ সাধবে সুতরাং তাকে নিরুপায় হয়ে বসে থাকতে হয়। আবার শাক সব্জী উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রম ব্যয় করে নারী কিন্তু এগুলো বাজারজাত করার দায়িত্ব পুরুষের। এভাবে নারী তার শ্রমের ফলাফল ভোগ করতে পারছে না। অর্থাৎ বিনা পারিশ্রমিকেই তার শ্রম নিঃশেষিত হয়।

তাছাড়া ডিবুয়াপুর গ্রামের নারীরা বর্তমানে বিভিন্নধর্মী পেশাতে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সামাজিক জীবনে পুরুষ প্রাধান্য প্রবল বলে ঘরের বাইরে কিংবা ঘরে বসেও পুরুষের পাশাপাশি শ্রমে অংশ নিতে সক্ষম হচ্ছে না, নারীরাও গৃহের বাইরে কাজ করার চেয়ে গৃহের অভ্যন্তরে থাকাটাই যুক্তিযুক্ত মনে করে। এটাও বহুদিনের গড়ে ওঠা মূল্যবোধ। তাই গ্রামে এনজিওদের তৎপরতা এবং নারীর বিভিন্ন ধর্মী পেশার সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে সাধারণ নারী সমাজ যেমন অবহেলার চোখে দেখছে তেমনি পুরুষরা মানসিকভাবে এর বিরুদ্ধচারনেই ব্যস্ত। নায়লা কবিরের একটি বক্তব্য এ প্রসংগে উল্লেখ্য, "নিজেদের অধঃস্তনতাকে নারীরা যদি এতদিন মেনে নিয়ে থাকে তবে তা আংশিকভাবে প্রচলিত লিঙ্গীয় মতাদর্শের ক্ষমতার জন্য এবং এসব বিধি বিধান এবং মূল্যবোধের প্রতি তাদের নিজস্ব আত্মস্থতার কারণে। নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্পর্কের চরম অসমতার কারণে সমাজ পদ্ধতি যেভাবে নির্দিষ্ট করে দেয় তার অন্যটা করার নারীদের তেমন সুযোগও নেই। পিতৃতান্ত্রিক দরকষাকষির ভিত্তিও এ অসমতাই।"[১০]

মূলতঃ ডিবুয়াপুর গ্রামের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে মাতবর, চেয়ারম্যান, মেম্বার এ শ্রেণীর লোকেরা যারা গ্রামীণ শ্রমের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে, তারা গ্রামের সম্মান রাখার নামে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে। স্বামীরা নিতান্ত বাধ্য না হলে স্ত্রীদের পরিবারের বাইরে শ্রম দেয়াটা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। পরিবারে প্রদত্ত শ্রমও পুরুষ নারী কারো কাছে শ্রম বলে বিবেচিত হয় না। ডিবুয়াপুর গ্রামে কোন বাড়ীতে গিয়ে যখন জিজ্ঞেস করছি 'আপনি কি করেন?' নারী সভয়ে উত্তর দিয়েছে কিছুই করি না। অথচ সে আমার সামনে অনবরত কাজ করে যাচ্ছে। স্বামীও বলেন আমার স্ত্রী কোন কাজ করেন না ঘর সংসার করেন। ডিবুয়াপুর গ্রামে পুরুষরা যে সমস্ত পেশায় নিয়োজিত তার কোন একটিক্ষেত্রে মহিলাদের উপস্থিতি নেই।

সারণী সমূহের উৎসঃ–

আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস, পটুয়াখালী।

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রামীণ ভূমিহীন মহিলা/অর্থনৈতিক উন্নয়ন/বৈদেশিক সাহায্য

আমি আমার গবেষণার বিষয় এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ডিবুয়াপুর গ্রামের চল্লিশটি ভূমিহীন পরিবারের চল্লিশজন নারীকে কেন্দ্র করে মৌলিক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছি। পূর্বেই উল্লেখ করেছি আমার গবেষণার বিষয় "গ্রামীণ ভূমিহীন মহিলাদের উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে আমি মূলতঃ দেখতে চেয়েছি বৈদেশিক সাহায্য সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গ্রামের প্রান্তস্থিত দরিদ্র মহিলাদের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রকৃত চিত্র। অর্থাৎ এ সাহায্য তাদের জীবনধারাকে কতটা প্রভাবিত করেছে। অন্য অর্থে বলা যায় বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষুদ্র একটি অংশ গ্রামের মহিলাদের জীবনধারার সংগে কতটা গভীরভাবে সংযুক্ত হয়েছে। এ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্য আমি ডিবুয়াপুর গ্রামে 'আশার' আয় বৃদ্ধিকারী ঋণদান প্রকল্পের সংগে সংশ্লিষ্ট ভূমিহীন সমিতির মহিলাদের উপর গবেষণার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছি। আশা বিগত চার বৎসর যাবৎ দুটি ভূমিহীন সমিতির মাধ্যমে চল্লিশজন মহিলাকে সংগঠিত করছে এবং স্বল্প মেয়াদে স্বল্প পুঁজি ঋণ হিসেবে এদের হাতে পৌঁছাচ্ছে। আশার কাগজ পত্রাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং আশার কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মাধ্যমে জানা যায় মহিলাদের নিয়ে সংগঠিত ঋণদান কর্মসূচীতে তারা আশাবাদী কারণ এ প্রক্রিয়ায় ঋণের মাধ্যমে তারা বিভিন্নভাবে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করছে। যেমন মুড়ি ভাজা, ছোট্ট হোটেল পরিচালনা, ডিম বিক্রী, ধানচালের ব্যবসা প্রভৃতি এভাবে গ্রামের ভূমিহীন পরিবারগুলোর আয়ের পথ তৈরী হচ্ছে খাদ্যের সংস্থান হচ্ছে– কিছুটা হলেও তাদের দারিদ হ্রাস পাচ্ছে। আশা জানিয়েছে ঋণফেরৎ পাবার ক্ষেত্রে তাদের তেমন গুরুতর কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি। আশা এ প্রক্রিয়ায় দরিদ্র নারীদের উন্নয়নের সাফল্যের আশা করছে। নিম্নে আশা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হ'ল ঃ

আশা (Association for social advancement)

১৯৭৮ সালে বিভিন্ন এনজিওর কিছু সমমনা উন্নয়নকর্মী একটি যৌক্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হয়ে 'আশা' নামের সংগঠনটির জন্ম দেয়। একেবারে গোড়ার দিকে তারা সংগঠিত হয়েছিল– ক্ষমতাহীন জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত এবং আভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রতি তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সহায়তার মাধ্যমে ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মানসে। উন্নয়ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা প্রত্যক্ষ করেছে বর্তমান অসম এবং প্রতারণাপূর্ণ আর্থ–সামাজিক কাঠামোতে কেবলমাত্র ধনী এবং ক্ষমতাবানরা লাভবান হন। এ অসম সামাজিক কাঠামোতে দারিদ্র দূরীকরণ হচ্ছে প্রাথমিক শর্ত। এরজন্য প্রয়োজন সামাজিক সাম্য ও কাঠামোগত পরিবর্তন এবং প্রান্তস্থিত পর্যায় অংশগ্রহণমূলক গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় একটি সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠানের ক্যাডার শ্রেণী। অর্থাৎ আশার কর্মীরা কাজ করবে কমিটমেন্ট নিয়ে। তাদের উপলব্ধি অনুসারে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দরিদ্রজনগোষ্ঠীর দারিদ্র অবসানকল্পে কোন কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারছে না। সেক্ষেত্রে তাদের মত সাহায্য সংস্থাগুলো গ্রামপর্যায় সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে এক্ষেত্রে তারা বামদলগুলোর কার্যকারিতার ব্যাপারেও সন্দিহান

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'আশা' মানিকগঞ্জে মাত্র চার লক্ষ টাকা বৈদেশিক অনুদান নিয়ে তার কাজ শুরু করে। বর্তমানে 'আশা' বাংলাদেশের কেন্দ্র থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। তার বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। চারিত্রিক বৈশিষ্ট, কর্মকান্ড এবং আশার কর্মকর্তাদের বক্তব্যানুসারে এটি

একটি এন.জি.ও। বর্তমানে আশার বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ সর্বমোট ৮৫৪,২১৬,২০০ কোটি টাকা মাত্র। আশাকে সাহায্য দানকারী সংস্থাগুলো হচ্ছে ঃ-

1. Misereor, Germany
2. Cebeno, Netherlands
3. Dia, Netherlands
4. Heks, Switserland
5. Danida, Bangladesh
6. CAA, Australia
7. PKSF, Bangladesh
8. Eip, Netherlands
9. Pact, Bangladesh
10. Danida fellowship Centre- Denmark

আশার উন্নয়নের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট হ'ল Growth with equity এবং উদ্দেশ্য হ'ল নিম্নরূপ ঃ

১) ক্ষমতাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে দাড়াতে সাহায্য করে তাদের ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়া।
২) অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় সমিতি গড়া ও তাদের সদস্যদের উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংযুক্ত করা।
৩) আয়বৃদ্ধি প্রকল্পের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করা,
৪) সমাজের সর্বস্তরে মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা,
৫) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে শিক্ষা দেয়া,
৬) ভূমিহীন শ্রেণীকে কার্যকরী স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে সংগঠিত করা,
৭) অবিরত গ্রুপ ডিসকারশন ও সংলাপের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া,
মূলত: মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ এ দুটোই ছিল আশার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তু।

আশার বর্তমান বাংলাদেশের ৬০% এর অধিক ভূমিহীন অধিকারবঞ্চিত নারী পুরুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে তার কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। তবে আশা জানিয়েছে লক্ষ্যে তার কর্মকান্ডের ৯০% নারী কেন্দ্রিক। নিম্নে আশার 'নারী উন্নয়ন' কর্মসূচী ব্যাখ্যা করা হ'ল ঃ

নারী উন্নয়ন ও আশা (Association for Social Advancement)

আশা মনে করে বর্তমান সমাজব্যবস্থার নারীরা সবচেয়ে বঞ্চিত, অবহেলিত ও অসম অধিকারভোগী। বিশেষত বাংলাদেশে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা অত্যাধিক বঞ্চিত। স্বতন্ত্রভাবে বাংলাদেশের গ্রামের মহিলারা এ পর্যায়ভুক্ত। আমাদের বর্তমান প্রতারনা পূর্ণ আর্থ সামাজিক কাঠামোতে মহিলারা দ্বৈত শাসন ও শোষণের শিকার।

প্রথমত: সমাজ ব্যবস্থা দ্বারা;
দ্বিতীয়ত: পুরুষ দ্বারা;
বিশেষত অধিকাংশ গ্রাম অঞ্চলে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা ও মজুরীর হার পুরুষদের তুলনায় অত্যন্ত নিম্নমানের। পরিবারে অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণের অভাবে মহিলারা অধ:স্তন অবস্থায় জীবনযাপন করে। স্বাধীনভাবে তারা নিজস্ব জীবনের চাহিদা পূরণে কখনোই সমর্থ হয় না। এসব কারণে তারা খাদ্য, চিকিৎসা এবং ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত। বিদ্যমান পর্দাপ্রথা তাদেরকে সামাজিক,

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে দিচ্ছে না। শারীরিক অসুস্থতা, অবিচার পাশবিক নির্যাতন, বাধ্যতামূলক তালাক, বাল্যবিবাহ, যৌণ প্রতারণা, ধর্ষণ এগুলো বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আশা মহিলাদের উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেরকে এ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে চায়। এর জন্য প্রয়োজন তাদের জীবনের মৌলিক পরিবর্তন। এ লক্ষ্যে আশার কৌশল হ'ল ঃ

১) মহিলাদের গ্রুপের মধ্যে সংগঠিত করে তাদের জ্ঞানের পরিধি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দক্ষ নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে তাদের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তোলা,
২) শিক্ষাদান কর্মসূচী এবং গ্রুপের মাধ্যমে তাদেরকে অবিরত স্বীয় ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা যাতে তারা সামাজিক ও পারিবারিক অবহেলা, বঞ্চনা ও অপমানের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে।
৩) ঋণদান প্রক্রিয়ার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হবে যাতে এর মাধ্যমে তারা পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে।
৪) প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষা দান,
৫) সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ক্যাম্পিং এর মাধ্যমে মহিলাদের প্রতি নির্যাতন এবং অবিচার সম্পর্কে জনমত গড়ে তোলা।

আশা দাবী করে পরিচালিত এ সব কর্মসূচীর মাধ্যমে মহিলারা পরিবার ও সমাজে মর্যাদাবান হচ্ছে। তারা তালাক, পর্দা, বাল্যবিবাহ, যৌন নির্যাতন, পাশবিক অত্যাচার প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজস্ব অধিকার আদায় করে নিচ্ছে। আশা পটুয়াখালী, নরসিংদী, ময়মনসিংহ প্রভৃতি এলাকায় কাজ করে যাচ্ছে। তারা আশাবাদী যে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে মহিলাদের পুরুষ সদস্যের উপর নির্ভরশীলতা কমে যাচ্ছে। পারিবারিক সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াতে তারা অংশ নিচ্ছে। প্রকল্প এলাকাতে মহিলাদের সামাজিক মূল্যবোধ ও আচরণের পরিবর্তন ঘটছে। Asha demand, "Asa's women development programme not only deals with credit programe but also equality emphasis on social action. The cerdit is treated here as an impoementary factor to steengther the social action."

আশার উন্নয়নকর্মীরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখেছে গ্রামের ভূমিহীন জনগণ জোতদার ব্যবসায়ী মহাজনী ঋণের জালে আবদ্ধ হয়ে ক্রমাগত নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং গ্রুপ সৃষ্টির মাধ্যমে ঋণপ্রদানের মাধ্যমে যেমন এদেরকে সনাতন পদ্ধতির হাত থেকে নিষ্কৃতি দেয়া সম্ভব তেমনি ঋণ দ্বারা আয়বৃদ্ধি প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব। এ ঋণ কর্মসূচীতে আশা নারী সমাজকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। আর্থ সামাজিক ঋণদান কর্মসূচী এবং অন্যান্য কর্মসূচীকে 'সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

আশার সামাজিক অর্থনৈতিক ঋণদান কর্মসূচী– (Socio-Economic Credit Programme)

আশা ১৯৭৮ সালে তার প্রকল্পভুক্ত বন্যাকবলিত বিভিন্ন এলাকায় তার সামাজিক অর্থনৈতিক ঋণদান কর্মসূচী চালু করে। এ প্রকল্প শুরুর পূর্বে আশা আবিষ্কার করে গ্রাম এলাকায় দরিদ্র জনগণ বড়লোক বন্ধু (Rich friends), আত্মীয়স্বজন, মহাজন, দোকানদার, বাজারের মধ্যস্থতাকারী এবং Semi-urbon employers এর নিকট থেকে অর্থ ধার নেয়। এরা দুটো পদ্ধতিতে টাকা ধার দেয় (১) ঋণ শোধ দিতে না পারলে জমি দিয়ে দিতে হবে।

(২) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুদসহ ফেরৎ দিতে হবে। এতে করে গ্রামের জনগণ নির্দিষ্ট সময় ঋণশোধ করতে না পেরে জমির মালিকানা হারিয়ে নি:স্ব হয়ে যায়। গ্রামের জনগণকে এ প্রতারনামূলক পদ্ধতি থেকে মুক্ত

করার উপায় হিসেবে আশা উদ্যোগ নেয় ঋণদান কর্মসূচীর এবং দাবী করে এ কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামের ভূমিহীন জনগণ বিভিন্নভাবে সুফল লাভ করেছে। আশা মূলত: মহিলাদের সংগঠিত করে ঋণ প্রদান করে।

আশার মতে–

(১) ঋণ ভূমিহীন শ্রেণীকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করে।
(২) উৎপাদমূলক যন্ত্রপাতির উপর নিজস্ব মালিকানা সৃষ্টি হয়।
(৩) ঋণ কর্মসূচী গ্রামীণ মহিলাদের পরিবার ও সমাজের অন্যায় ও অবহেলা থেকে মুক্ত করে।
(৪) ভূমিহীন পরিবার পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে পারে, বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে সক্ষম হয়।
(৫) স্থানীয় মহাজনের ঋণের জাল থেকে মুক্ত করে।

ঋণদান প্রক্রিয়া ঃ

আশার স্বল্পমেয়াদী ঋণদান কর্মসূচীতে গ্রামের ভূমিহীন জনগোষ্ঠী অনুপাতে গ্রুপের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে ০ থেকে ২ বিঘা পর্যন্ত জমি হচ্ছে ভূমিহীন শ্রেণীর নির্ধারক। যাদের মাসিক কোন আয়ের উৎস থাকে (বিশেষত চাকুরী, ব্যবসা) তাদেরকে অন্তর্ভূক্ত করা হয় না। প্রতিটি গ্রুপে বিশজন (২০জন) করে সদস্য নেয়া হয়। এতে একটি গ্রামে ভূমিহীন জনসংখ্যা অনুপাতে ২ থেকে ৬টি পর্যন্ত গ্রুপে থাকতে পারে। প্রাথমিকভাবে গ্রুপে অন্তর্ভূক্তির পর ছয়মাস মেয়াদী স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, নিরক্ষরতা এবং উৎপাদমুখী ও উপার্জনক্ষম, বিভিন্ন প্রকল্প যেমন সেলাই, হাঁসমুরগী পালন শাকসব্জী চাষ, মুড়িভাজা এ সমস্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়াও আশার নিয়মকানুন সম্পর্কে সদস্যদের অবগত করানো হয়। যারা দল গঠনের সমস্ত নিয়মকানুন মেনে নিতে পারেন তারাই ঋণপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করেন। সাপ্তাহিক মিটিং এ নিয়মিত হাজিরা, কিস্তি ফেরৎ দেয়া, সঞ্চয় করা, শিক্ষা ও সচেতনতা প্রশিক্ষণ প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ শুরুর পূর্বে প্রত্যেক সদস্যকে উন্নয়নমূলক শিক্ষা কর্মসূচীতে অংশ নিতে হয়।

প্রথম পর্যায় একজন সদস্য ১০০০ টাকা থেকে পরবর্তীতে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারে। এতে তাকে প্রত্যেক বছরের সমস্ত কিস্তি ও লোন শোধ করে পুনরায় ঋণ নিতে হয়। প্রত্যেক সদস্যকে অন্তত প্রতি সপ্তাহে চার টাকা করে সঞ্চয় করতে হয়।

আশা মনে করে এভাবে ঋণদান প্রক্রিয়ার সফলতার মাধ্যমে তারা গ্রামীণ জনগণকে মহাজনী ঋণের চক্র থেকে উদ্ধার করত সক্ষম হচ্ছে এবং মহিলাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পারছে। এ লক্ষ্যে আশার তৎপরতার ক্ষেত্র হ'ল ২১টি জেলা এবং ৬৪টি থানা পর্যায়। ইউনিট অফিসের সংখ্যা হচ্ছে ১৯৭টি। জুন '৯৪ এর মধ্যে আরও ৮টি থানায় তার কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। এতে করে তাদের বাড়তি ইউনিট অফিসের সংখ্যা দাড়ানোর কথা ৩৬টি। একটি ইউনিটে কমপক্ষে ১২টি গ্রাম থাকে।

ঋণদান কর্মসূচীর অনিবার্য শর্ত উন্নয়নমূলক শিক্ষা/ সচেতনতা শিক্ষা ঃ

মহিলাদের আত্ম উপলব্ধি, আত্ম পরিচয় এবং আজন্ম দেখা সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা দেয়া ও জানানো আশার উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর অন্তর্গত। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক সম্পর্ক তৈরী, পরিবারের যত্ন এবং নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে জ্ঞাত হয়। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে দক্ষতা এবং শিক্ষা তাদের প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করে। মহিলারা তাদের নিজেদের চাহিদা সম্পর্কে সচেতন হলে আভ্যন্তরীন সম্পদের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা অর্জন করতে পারবে। এতে করে তাদের মানসিক দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং তারা বর্তমান অদক্ষ আর্থ সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারবে।

এ লক্ষ্যে মহিলাদেরকে আশা ৬ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ ব্যতীত প্রতিসপ্তাহের মিটিং এ সচেতনতা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করে থাকে। একজন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষা বিষয়ক দায়িত্ব পালন করেন। মহিলা ও পুরুষদের শিক্ষার জন্য তিনটি বই রয়েছে।

১. নতুন পথ ২. বর্ণ ও বোধ (বয়স্ক শিক্ষার জন্য) ৩. বর্ণ ও চেতনা। এ বই তিনটির বিভিন্ন বক্তব্য হচ্ছে আলোচনা ও সচেতনতা শিক্ষার মাধ্যম। নিরক্ষরতা দূরীকরণে তাদেরকে নাম লিখতে সাহায্য করা হয়। উপরোক্ত বই তিনটিতে আশা তাদের প্রাথমিক পর্যায় দেয়া বক্তব্যের মতই র‍্যাডিক্যাল কথাবার্তার সংযোজন ঘটিয়েছে। যেমন– আমাদের লক্ষ্য সমাজের মৌলিক পরিবর্তন, প্রতিটি উচ্চারণ হোক সমাজ বদলের হাতিয়ার। বর্ণ ও চেতনা পুস্তকে ক্ষ দিয়ে লেখা আছে– 'ক্ষমতা আছে তার। টাকা আছে যার। পরিবারের কর্তা পুরুষ। তিনি রোজগার করেন। তাই এত ক্ষমতা। আমরা টাকা আয় করব। ক্ষমতাবান হব।" অন্যদিকে বর্ণ ও বোধ বাইরে আছে ধনীদের হাতে সব ক্ষমতা। তাই তারা আমাদের শোষণ করে। আমরা গরীব। দলবেঁধে ক্ষমতাবান হব। শোষণ ঠেকাবো।" এ আঙ্গিকে আরও কিছু বক্তব্য আছে যেমন– "থানা অভিযোগের জায়গা। উপজেলায় থানা অফিস। থানায় অভিযোগ করা হয়। মহিলারাও অভিযোগ নিয়ে থানায় যেতে পারেন। এতে কোন দোষ হয় না। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করুন। নিজের অধিকার আদায় করুন।" ধর্ষণ করা বড় অপরাধ। ধর্ষিত হলে থানায় অভিযোগ করুন। ধর্ষিতা নারীর অপরাধ নাই। ধর্ষণকারী অপরাধী। অপরাধীর সাজা হয়।" আবার একই বইয়ে দ্বান্দ্বিক বক্তব্যও পাওয়া গেছে যেমন– নারী পুরুষ নিয়ে সমাজ। নারী পুরুষে ভেদ নাই। বিভেদ ভুলে সংসার গড়ি। মিলেমিশে কাজ করি।" আমাদের নগদ টাকা নাই। স্বামীর আয়ে বেঁচে থাকি। ঘরে মান নাই। ঘরেও কাজের দাম পাই না। আয় করব মান বাড়াব। নিজের পায়ে নিজে দাড়াব।" এ ধরণের বহুবিধ বক্তব্য আশা রচিত বইয়ে আছে যা তার নারী এবং পুরুষ সদস্যদের শিক্ষা দেয়া হয়।

আশা তার কর্মতৎপরতায় আশাবাদী। বর্তমান সময় তারা দারিদ্র বিমোচনের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। ঋণদান কর্মসূচীর সাফল্য বর্তমানে আশার প্রধান লক্ষ্য। তবে তারা আরও কিছু নতুন আয় বৃদ্ধিজনিত কর্মসূচী চালু করতে চায়। যেমন রাস্তা বাধা, আগাছা পরিষ্কার, পুল তৈরী ও মেরামত ইত্যাদি। প্রাথমিকভাবে আশা বহু প্রতিরোধমুলক তৎপরতা প্রদর্শন করেছে। বর্তমানে এর তেমন কোন অস্তিত্ব নেই। আশা মনে করে বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশে এ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ক্ষুধানিবৃত্তি ব্যতীত অন্যকোন সমস্যা এত গুরুতর নয়।

আমি আশার তত্ত্বগত এবং বাস্তব দুটো প্রেক্ষিত নিয়েই তাদের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি। জানতে চেয়েছি বিভিন্ন বিষয়ের ফলাফল, উপযোগিতা এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে। এ ব্যাপারে গ্রামীণ মহিলাদেরকেও প্রশ্ন রেখেছি– জানতে চেয়েছিলাম আশার সম্পর্কে তাদের বাস্তবিক ধারণা। পরবর্তীতে আমি এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

নিম্নে ডিবুয়াপুর গ্রামে আশার সামাজিক-অর্থনৈতিক ঋণদান কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত চল্লিশটি ভূমিহীন পরিবারের চল্লিশজন নারী অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাঠ পর্যায় সংগৃহীত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হ'ল ঃ

আশা ও ভূমিহীন নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ

ডিবুয়াপুর গ্রামে বসবাসরত ৯৬টি ভূমিহীন পরিবারের মোট মহিলার সংখ্যা ২৯০ জন। (প্রাপ্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক মিলিয়ে) এর মধ্যে চল্লিশটি পরিবারের মহিলার সংখ্যা ১০২ জন। ঐ চল্লিশটি পরিবারের চল্লিশজন প্রাপত বয়স্ক নারী ভূমিহীন সমিতির সদস্যা। ডিবুয়াপুর গ্রামে আশার দুটি সমিতি আছে। একটি 'সোনালী' ভূমিহীন মহিলা সমিতি, অন্যটি 'একতা' ভূমিহীন মহিলা সমিতি। প্রত্যেকটি সমিতিতে বিশজন করে সদস্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়। আশার তিনজন মাঠকর্মী, এবং একজন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে এ দুটি সমিতি গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। 'সোনালী ভূমিহীন সমিতির কর্মস্থল পূর্ব পাড়ায় ধলু মুন্সীর বাড়ী। অনেকেই এ বাড়ীকে রাজ্জাক হাওলাদারের বাড়ী বলে জানে। প্রতি শনিবার সকাল ৭৩০ মিনিটে ঐ বাড়ীতে কাসেম হাওলাদারের

ঘরে সমিতির সদস্যারা সমবেত হন কিস্তি পরিশোধ, নতুন ঋণ গ্রহণ এবং পাঠদানের উদ্দেশ্যে। সোনালির সভানেত্রী আয়তুন্নেছা বেগম। তিনি বিধবা এবং পরিবার প্রধান। আয়তুন্নেছার নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় তিনি '৯০ এর মাঝামাঝি সময় (জুন জুলাইয়ের দিকে) পাশ্ববর্তী গ্রাম সারিকখালী বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে আনোয়ারা নামে তার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে 'আশা'র (আশারী ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংকের অনুকরণে) খবর পান। তিনি জানতে পারেন আশা গরীব মহিলাদের টাকা, বাড়ী, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা প্রভৃতির ব্যবস্থা করবে। আয়তুন্নেছার ভাষায় এমন ছিল, "আনোয়ারার ধারে শুনলাম আশারী ব্যাংক টাহা খালি বেচে, (ছড়াচ্ছে) যদি সদস্য অই (হই), লেহাপড়া করি তয় টাহা দেবে, হেইয়া হইন্যা মনে মনে ভাবলাম যাই করাক টাহা তো পামু সুতরাং আশারী ব্যাংকে নাম লেহাইতে অইবে।" আয়তুন্নেছা গ্রামে এসে তার মত দরিদ্র মহিলাদের জানায় আশার খবর। প্রথমে কেউ বিশ্বাস করেনি। পরবর্তীতে আয়তুন্নেছা আনোয়ারার সংগে আশা অফিসে যায় এবং ঋণ নেয়ার সদিচ্ছা প্রকাশ করে। আশা অফিস জানায় তারা ডিবুয়াপুর গ্রামে জরীপের কাজ পুর্বেই শেষ করেছিল এবং ডিবুয়াপুর গ্রামের ভূমিহীন মহিলারা ঋণ নিতে আগ্রহী জেনে ঐ গ্রামের ভূমিহীন মহিলাদের সংগঠিত করার জন্য মাঠ পর্যায়ের কাজ শুরু করে '৯০ এর আগস্টে। সোনালী ভূমিহীন সমিতির সদস্যারা জানিয়েছে তারা আনোয়ারা এবং আয়তুন্নেছার নিকট থেকে আশার সংবাদ পেয়েছে। শুধুমাত্র একজন সদস্যা পাশ্ববর্তী গ্রামে ভিক্ষা করতে গিয়ে আশার সংবাদ পায়।

অন্যদিকে একতা ভূমিহীন সমিতির কর্মস্থল ডিবুয়াপুর গ্রামের উত্তর পাড়ায় খলিল মৃধার বাড়ী। প্রতি সোমবার ৭-৩০ মিনিটে একতার সদস্যরা এখানে সমবেত হন। একতার সভানেত্রী রাজিয়া বেগম। বিবাহিত এবং স্বামী জীবিত। আশার মাঠ কর্মীরা তাদের ঋণ গ্রহণ এবং গ্রুপে অন্তর্ভূক্তির ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছেন বলে জানান।

একতা ও সোনালী ভূমিহীন সমিতির সদস্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় তাদের প্রথমত তিনমাস নিয়মিত গ্রুপে যাতায়াত করতে হয়। মূলত: এ তিনমাস দলীয় সদস্যাদের প্রশিক্ষণের সময়। এ সময়কালে গ্রুপের সদস্যাদের গ্রুপ সম্পর্কে ধারণা প্রদান, দলীয় স্বার্থ, দল গঠন, নিয়মাবলী, শৃংখলা, একতা, সঞ্চয়, ঋণ, আয় প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয়। সাথে সাথে অক্ষর সম্পর্কে ধারণা দেয়ারও চেষ্টা করা হয়। তিনমাস উত্তরকালে ঋণ প্রদানের বিষয়টি মাঠকর্মীরা সদস্যাদেরকে অবহিত করেন। আশার সদস্যরা অনেকেই মনেকরে বলতে পারে নি প্রথম তিনমাস প্রশিক্ষণের বিষয়াবলী কি ছিল। দশ বারজন বলেছে স্বাস্থ্যরক্ষা, বাচ্চার যত্ন, ঋণ নেয়া, ফেরৎ দেয়া ইত্যাদি শিখানো হয়। সোনালী ভূমিহীন সমিতির সদস্যা রোকেয়া বেগম জানান "আশার স্যার আপারা ভাল ভাল কথাই বলে অত কিছু মনে' রাখতে পারি না।" একতা ও সোনালীর সদস্যরা নিয়মিত সাপ্তাহিক মিটিং-এ উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করেন। কিস্তি ফেরৎ দিতে সমস্যা থাকলে অনেক সময় অনুপস্থিত থাকেন। তবে কিস্তি নির্দিষ্ট সময় ফেরৎ দিতে সবাই চেষ্টা করেন। পাঠদান সম্পর্কে সদস্যাদের আগ্রহ কম। সাপ্তাহিক সভায় তারা মাঝে মাঝে পড়েন। গ্রুপে সকালে গিয়ে দেখেছি সদস্যা এবং মাঠকর্মী উভয়ই নির্দিষ্ট সময়ের বেশ পরে উপস্থিত হন।

একতা ও সোনালী ভূমিহীন সমিতির সদস্যাদের মধ্যে তিনজন কেয়ার এর রাস্তা বাধার কাজে মজুরী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। ধানের মৌসুমে অনেকে বিভিন্ন বাড়ীতে ধানের কাজ করতে যান। আর যাদের ভিটা এবং জমি প্রভাবশালী আত্মীয়ের কাছে বন্ধক দেয়া তারা ঐসব বাড়ীতে যান প্রায়শই বিভিন্ন গৃহস্থালীর কাজে সহায়তা করতে।

ভূমিহীন সমিতির চল্লিশজন মহিলার মধ্যে তিনজন বিধবা, একজন স্বামী পরিত্যক্তা এবং একজনের স্বামী নিখোঁজ। বিধবা তিনজন হলেন জরিনা বেগম, আয়তুন্নেছা এবং সুফিয়া বেগম। জরিনা বেগম বর্তমানে ডিবুয়াপুর গ্রামে তার ভাই জাহের সিকদারের সাথে বসবাস করছে। ভাই তার অভিভাবক। বাকী দু'জন নিজেরাই পরিবার পরিচালনা করেন। স্বামী পরিত্যক্তা শাহবানু পিতার বাড়ীতে থাকেন। পিতা তার অভিভাবক। নবীতুন খাতুন যার স্বামী নিখোঁজ তিনি একাকী বসবাস করেন। বাকী পয়ত্রিশ জন মহিলার মধ্যে

দশজন শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী সন্তানসহ বসবাস করেন। পঁচিশজন স্বামী সন্তান নিয়ে আছে। নিম্নে উক্ত চল্লিশজন মহিলার বয়স সারণীতে উপস্থাপন করা হ'ল ঃ

সারণী - ১১

বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
২০-২৮	১৭	৪২.৫%
২৯-৩৭	১২	৩০%
৩৮-৪৬	১০	২৩%
৪৭-৫৫	১	৫০%
	৪০	১০০

আশা ভূমিহীন সমিতির মহিলাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় আমি সবাইকেই প্রশ্ন করেছি। বিভিন্নভাবে জিজ্ঞেস করে বের করার চেষ্টা করেছি। সবাইকেই জিজ্ঞেস করেছি "বাংলা পড়েছেন?" কারণ "আপনি কতদূর পড়ালেখা করেছেন বললে এরা কেবল মসজিদ কিংবা ঘরে আরবী পড়ার কথা জানিয়েছে। নিম্নে সারণীর মাধ্যমে চল্লিশ জন মহিলার শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখানো হ'ল ঃ

সারণী - ১২

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নাম লিখতে পারে	৫	১২.৫০%
I - V	১৮	৪৫%
VI - VIII	৩	৭.৫%
নিরক্ষর	১৪	৩৫%
	৪০	১০০%

ভূমিহীন পরিবার ও তাদের অতীতের অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ

ভূমিহীন পরিবারগুলোর নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় পাঁচ বৎসর পূর্বেও তাদের জীবনধারণ যথেষ্ট সমস্যা জর্জরিত ছিল। বিশটি (২০) পরিবার আনুমানিক পনের ষোল বছর ধরে চাষের জমি হারিয়েছে। এর মধ্যে আবার পনেরটি (১৫) পরিবারের বসতভিটাও নেই। বাকী বিশটি পরিবারের মধ্যে তেরজনের একবিঘার নীচে, দুজনের এক বিঘা, দুজনের দেড়বিঘা এবং তিনজনের দুইবিঘা করে জমি আছে। জমি এবং বসতভিটা হারানোর কারণ হিসেবে এরা দেখিয়েছে অতিবৃষ্টি কিংবা অনাবৃষ্টির কারণে ফসল না হওয়া ও স্বল্পতা, যৌতুকের কারণে জমি বন্ধক বা বিক্রী এছাড়া পরিবারের পুরুষের জমি বিক্রী কিংবা গ্রামের শক্তিশালী শ্রেণীর ষড়যন্ত্রেও বসতভিটা ও চাষের জমি হাতছাড়া হয়ে গেছে। চাষের জমি যার উপর পরিবারগুলোর জীবনধারণ নির্ভরশীল ছিল তা হারানোর ফলে তারা অভাব ও দারিদ্রের মধ্যে নিপতিত হয়। কারণ গ্রামে এমন কোন শ্রমের ক্ষেত্র ছিল না সেখানে শ্রম বিক্রী করে এ পরিবারগুলো তাদের নিত্যদিনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে পারত। গ্রামে ঘরামী, মাটি কাটা, ধানের মৌসুমে কামলা খাটা নৌকা চালনা এ ধরণের কাজ করা যেত। তবে এ থেকে যা পারিশ্রমিক মিলত তাতে পুরো পরিবারের সদস্যদের কোন রকম একবেলা খাবার সংগ্রহ করা যেত। এ ধরণের কাজও প্রতিনিয়ত পাওয়া যেত না। অন্যের জমিতে বর্গা খাটত অনেকেই- এক্ষেত্রে যেমন ছিল প্রতিযোগিতা তেমনি আয়ের তুলনায় ব্যয় হত বেশী। ৭/৮ জন বাদে উক্ত পরিবার গুলোর প্রায় সব পুরুষ সদস্যই শহরে দিনমজুরীর কাজ করত। সেক্ষেত্রেও তাদের প্রতিদিন কাজ মিলত না। এর মধ্যে যারা রাজমিস্ত্রী

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা রিক্সাচালনার কাজ করত তাদের কিছুটা আয় হত। রোকেয়া বেগম ভূমিহীন সমিতির সদস্যা তার অতীত স্মৃতি হাতড়ে বলেন, "সারাদিন পর সন্ধ্যাবেলা স্বামী চাল বা আটা নিয়ে বাড়ী ফিরত তারপর খাবার জুটত।" পরিবারের সদস্যরা ক্ষুধা নিবৃত্তি ব্যতীত অন্য চাহিদা পূরণে মনোযোগ দিতে পারতেন না। সন্তানদের স্কুলে পাঠাবার ব্যাপারে তাদের তেমন কোন উদ্যোগ না থাকলেও গ্রামের মধ্যে ফ্রি প্রাইমারী স্কুল থাকাতে ছেলেমেয়েরা পাড়াপ্রতিবেশী মিলে স্কুলে যেত। কিন্তু দেখা যেত পরিবারের শ্রমের তাগিদে কিংবা উপকরণের অভাবে স্কুল ছেড়ে দিতে হচ্ছে। শিক্ষার বিষয়টি তারা এতটা গুরুত্ব দিয়ে ভাবতেন না।

বিশটি পরিবারের দেয়া তথ্যানুসারে তাদের প্রায় ৪ বিঘা করে ধানী জমি ছিল। পনেরটি পরিবারের ৫বিঘা এবং বাকী ৬টি পরিবারের ৫$\frac{১}{২}$ থেকে ৬ বিঘার মত জমি ছিল। বত্রিশটি পরিবরের নারীরা জানায় জমির উপর নির্ভরশীলতা চলে যাবার পর তারা একবেলা ভাত বা রুটি খেত। ৭/৮টি পরিবার জানিয়েছে তারা নিজেদের স্বল্প জমি চাষ ও বর্গা খেটে দু'বেলা খেতে পারত। অন্য পরিবারগুলোর মত এতটা নি:স্ব ও রিক্ত হতে হয়নি।

চল্লিশটি পরিবারের মধ্যে যাদের চাষের জমি ও ভিটাবাড়ী দুটোই হারিয়েছে তাদের অবস্থা ৫/৭ বৎসর আগে ছিল বেশী দুর্দশাগ্রস্ত। ভিটাবাড়ীর অভাবে আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশীর বাড়ী বা পতিত জমি কিংবা নিজের বন্ধকী জমিতে বসবাস করতে হত। এরা গ্রামে খুব অবহেলিত। গ্রামীণ ভাষায় এদের বলা হয় উডউইবরা এসব পরিবারের মহিলারা জানান তাদের বিয়ে হয়ে যেত ১০/১২ বৎসরে এবং জীবন শুরুর প্রথম পর্যায় তারা দরিদ্র পর্যায়ভুক্ত থাকলেও তিনবেলা খেতে পারত। যার বাড়ী ছিল সে অন্তত বাড়ীতে শাকসবজী, গাছপালা লাগিয়ে কিছুটা হলেও সংসারের প্রয়োজন মিটাতে পারত। নারী সদস্যাদের কাজের ক্ষেত্র ছিল সীমিত। ধানের মৌসুমে ধান বা চালের বিনিময়ে শ্রম দেয়া, অন্য বাড়ীর ঘর ও উঠান লেপা, পানি তুলে দেয়া এসব কাজ করা যেত। সবার পক্ষে বাচ্চা রেখে কাজ করতে যাওয়াও সম্ভব হত না। আবার পারিবারিকভাবে অন্য বাড়ীতে কাজ করা অসম্মানজনক হত বলে কাজ করা সম্ভব ছিল না। উপরোক্ত কাজের ক্ষেত্রেও তারা অর্থ নয় ভাত চালের বিনিময় করত।

ভূমিহীন পরিবারগুলোর মতে একদিকে তারা নিঃস্ব হয়েছে, অন্যদিকে জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে, কাজের অভাব স্বল্প পারিশ্রমিক সব মিলিয়ে তারা ছিল অভাবগ্রস্ত। এছাড়া যৌতুকের কারণেও তাদের অর্থাভাব প্রকট হয়েছে। বিবাহিত কন্যা পিতার গৃহে অবস্থান, জামাইদের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে পরিবারগুলো আর্থ-সামাজিক দুটো দিক দিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের মতে তারা বেঁচে ছিল এবং এখনও আছে কিন্তু যথেষ্ট কষ্টের বিনিময়ে। ঐ সময়কালে তাদের ঋণও হয়েছে প্রচুর। তবে পরিবারগুলো বলেছে জমি হাতছাড়া হয়ে যাবার পূর্বে তাদের খাওয়া, পড়ার ক্ষেত্রে অভাব ছিল না। তারা তিনবেলা খেয়ে ন্যূনতম মানের কাপড়চোপড় পরিধান করতে পারত।

দারিদ্রপীড়িত অবস্থায় এ পরিবারগুলোকে গ্রামের আত্মীয় স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, একই গ্রামে বসবাসরত ধনবানশ্রেনী যেমন বিপদে সাহায্য সহযোগিতা করেছে তেমনি সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করেছে। তাদের মতে গরীবদের সবাই-ই প্রতারনা করে তবে গ্রামে মানুষের মধ্যে মায়ামমতা আছে বলেই আজও তারা টিকে ও বেঁচে আছে। ঐ সময়কালে পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও কলহ বেড়ে গিয়েছিল। অভাবের কারণে যৌথ পরিবার ভেঙেছে এরকম পরিবারের সংখ্যা তেরটি। পুত্র অন্নের সংস্থান করতে পারে না বলে বাবা-মা তাকে ছেড়ে ঢাকা চলে গেছেন একথা বলেছিলেন আকন বাড়ীর বউ আমেনা। মূলত: এসব পরিবারের জীবিকার একমাত্র উৎস জমি হওয়াতে তা হারানোর ফলে তারা যেমন আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি পারিবারিক ও সামাজক জীবনেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল।

আশা/ভূমিহীন নারী/বৈদেশিক সাহায্য ও তাদের বর্তমান অবস্থা ঃ

আমি ডিবুয়াপুর গ্রামের ভূমিহীন মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিত্র বের করতে গিয়ে দুটো বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছি। প্রথমত: যাদের নিয়ে গবেষণা করছি তারা নিঃস্ব ভূমিহীন দ্বিতীয়ত: যেহেতু তারা নিঃস্ব

সুতরাং তাদের উন্নয়নের মাত্রা নির্ধারণ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উন্নয়নের মানদন্ড হিসেবে দেখেছি আশার সংগে সংশ্লিষ্টতার ফলে পরিবারগুলোর মৌলিক চাহিদা কতটা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে এবং আশা প্রদত্ত ঋণের মাধ্যমে ভূমিহীন পরিবারগুলো নতুন কোন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে কিনা এক্ষেত্রে ডঃ সেলিম জাহানের বক্তব্য উল্লেখ্য "তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশে দরিদ্র ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকে চিহ্নিত করা হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ দ্বারা। নিশ্চিতভাবে মানুষের চাহিদা ব্যক্তিমানস ও সমাজকাঠামো নির্ভর যা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে কিংবা এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে ভিন্নতর হবে। এ ভিন্নতার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মানুষের জন্য একটি ন্যূনতম মৌলিক চাহিদাগুচ্ছ গড়ে তোলা সম্ভব যা ব্যক্তি বা সমাজ অনপেক্ষ এবং যা মানুষের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন। এ চাহিদাগুচ্ছের মধ্যে থাকবে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। দ্বিতীয়ত: তাদের জন্য আয়ের পথ সৃষ্টি বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।"[১১]

ভূমিহীন মহিলাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে চরম দারিদ্রপীড়িত অবস্থায় তারা যখন একেবারেই সমাজের নীচু তলায় অবস্থান করছিল তখন আশার সংগে তারা জড়িত হয়। ১৯৯১ সাল থেকে তারা ঋণ পাচ্ছে। প্রথম বছর ১,০০০ টাকা দিয়ে ঋণ দেয়া শুরু হয় এবং পরিশোধ করে দ্বিতীয় বছর ২,০০০ টাকা এভাবে ৫,০০০ টাক ।পর্যন্ত ঋণ নেয়া সম্ভব। ১৯৯৪ পর্যন্ত তারা ৪,০০০ টাকা ঋণ নিয়েছে। ঋণ নিয়ে মহিলারা সরাসরি কোন কাজে জড়িত হন নি তবে উল্লেখ্য যারা গরু কিনে দুধ বাজারে বিক্রী করছে তাদের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। কারণ গ্রামে গরুর পরিচর্যা, দুধ দোহনের কাজ মহিলারা করে থাকেন। মহিলারা জানান তারা হাটে বাজারে যেতে অভ্যস্ত নন, বাড়ীর পুরুষ সদস্যরাও এটা পছন্দ করে না। তাছাড়া ব্যবসা বানিজ্য তাদের চেয়ে পুরুষরা ভাল বোঝে বলে তাদের ধারণা। তাই টাকা নিয়ে স্বামী বা সন্তানকে দেন আয়ের পথ সৃষ্টি এবং পরিবারের চাহিদা মেটাবার জন্য। নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল চল্লিশটি ভূমিহীন পরিবারের কে কোন পেশা বেছে নিতে পেরেছে।

সারণী ১৩

পেশা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ধানচালের ব্যবসা	৪	১০%
কাঁচামালের ব্যবসা	১৯	২৭.৫০৫
গরু কিনে দুধ বিক্রী	৮	২০%
রিক্সা কিনে চালাচ্ছে	১০	২৫%
গাছ কিনে বিক্রী	৪	১০%
স্বল্প জমিতে চাষ	২	৫%
বন্ধকী জমি ছাড়িয়েছে	১	২.৫০%
	৪০	১০০%

এদের মধ্যে যারা কাঁচামাল ও ধানের ব্যবসা করে তারা একনাগাড়ে টাকা খাটাতে পারেনি। পারিবারিক বিভিন্ন অর্থকরী সমস্যা মিটিয়ে স্বল্প পুঁজি নিয়ে এরা ব্যবসা করে। তুলনামূলকভাবে গরু কিনে দুধ বিক্রী এবং রিক্সা কিনে চালনা এ দুটো পেশার পরিবার একটু ভাল অবস্থানে আছে। ধান চালের ব্যবসা করছে এরকম একটি পরিবার পাওয়া গেছে যাদের নিজেদের স্বল্প ($২\frac{১}{২}$ বিঘা) জমি চাষ করছে। গাছ কিনে বিক্রী, জমি কিনে চাষ দেয়া এবাং বন্ধকী জমি ছাড়িয়েছে এরকম পরিবার আর্থিকভাবে তেমন সুবিধা অর্জন করতে সক্ষম হননি। নিম্নে আমি বর্তমান আর্থিক অবস্থা অনুসারে পরিবারগুলোর শ্রেণীবিভাগ করেছি এবং তাদের মৌলিক চাহিদার কতটা পূরণ হচ্ছে এ বিষয় বের করার চেষ্টা করেছি।

১. প্রাপ্ত তথ্যে পাওয়া যায় ভূমিহীন সমিতির দশটি পরিবার একবেলা খাবার গ্রহণ করে। সময়টি দুপুর বা রাত। সকাল বেলা তারা অধিকাংশ সময় আধপেটা খেয়ে থাকে কিংবা খাবারের সংস্থান না থাকলে খায় না। চল্লিশটি পরিবারের মধ্যে তাদের পারিবারিক অবস্থা অন্যান্যদের মত ততটা সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছতে পারে নি। এর অন্যতম কারণ পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেশী। এদের সংসারে দশ/বার'র নীচে কারও সন্তান নেই। যদিও প্রতিটি পরিবারে দু/একটি করে মেয়ের বিয়ে হয়েছে তবুও দেখা যাচ্ছে এরা যৌতুকের দাবীতে আবার পিত্রালয় ফেরৎ এসেছে এবং সন্তানসহ অবস্থান করছে। এ ধরণের পরিবার পাওয়া গেছে ছ'টি। দুটো পরিবারে পুত্র সন্তানরা আয় করলেও বাবা মা থেকে স্বতন্ত্র থাকছে। এ পরিবারগুলোই আশা থেকে ঋণ নিয়ে কাঁচামালের (শাকসব্জী/ডিম/মাছ/মরিচ/লেবু) ব্যবসা করছে।

এদের খাবার মেনু সাধারণ। কারণ প্রতিদিনের খাদ্যের উপকরণ প্রতিদিন ক্রয় করতে হয়। খাবার হিসেবে ভাত/শাক, ভাত/ডাল, ভাত/আলুভর্তাই প্রধান। মাছ খেতে পারে মাসে একদিন, মাংসের ব্যাপারটি দুর্লভ। রোযা কিংবা কোরবানী ঈদে বিত্তশালী পরিবারের বাড়ীতে মাংস খেয়ে থাকেন। তারা জানান খাদ্যের পিছনে প্রতিদিন তাদের ন্যূনতম ৩০/৪০ টাকা ব্যয় হয়।

এ দশটি পরিবারেরই বসতভিটা নেই বলে তারা অন্যের বাড়ীতে বসাবাস করেন। তাদের বাড়ীঘরের অবস্থা জীর্ন। একটি বড় ঘরে ভাগাভাগি করে সবাই বসবাস করেন। এ পরিবারগুলোর ধানের খড় দিয়ে তৈরী মাটির ঘর। প্রতি দু'বৎসর অন্তর ঘরের ছাউনি পরিবর্তন করতে হয়ে। মহিলারা জানান প্রায়ই তাদের বাড়ীর মালিক বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলে কিন্তু নিরুপায় বলে তারা যেতে পারছে না। আশা'র ঋণ প্রাপ্তির পর থেকে এ সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হয় যেহেতু তাদের হাতে টাকা এসেছে সুতরাং বাড়ী ছেড়ে দেয়া উচিত। একখন্ড বাসপোযোগী জমি কেনার আকাংখা এদের সবারই প্রবল। কিন্তু সামর্থ হচ্ছে না।

বস্ত্র, শিক্ষা এবং চিকিৎসা এ তিনটি ক্ষেত্রে উপরোক্ত পরিবারগুলো তাদের চাহিদার ন্যূনতম অংশ পূরণ করতে সমর্থ হন। পরিবারের মহিলাদের পরিধেয় কাপড়চোপড় নিম্নমানের এবং জীর্ণ। শিশু সন্তানদের প্রায়ই কাপড়বিহীন শূণ্য শরীরে দেখা গেছে। ৮/৯ বছরের ছেলেমেয়েদের শুধু প্যান্ট পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। পুরুষদের বিষয়টি ভিন্ন– গ্রামের পুরুষরা শহরে যাওয়া ব্যতীত জামা বা ফতুয়া পড়েন না।

শিক্ষার ব্যাপারে ভিন্নমত লক্ষ্য করা গেছে। মহিলারা জানান প্রাইমারী পর্যায় ফ্রি পড়াতে পারলে তারা আপত্তি করেন না। টাকা পয়সা খরচ করে বেশী পড়ানোর ইচ্ছা তাদের নেই। তাছাড়া পরিবারের কাজে প্রয়োজন হলে সন্তানদের তারা স্কুলে যেতে দিতে চান না। এভাবেই এসব পরিবারের ছেলেমেয়েরা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী বা পঞ্চম শ্রেণী কিংবা একেবারে পড়ালেখা না করেও থাকে। মেয়েদের পড়াশুনার বিষয় তাদের মন্তব্য হচ্ছে লেখাপড়া করলেও বিয়ে, যৌতুক এসব সমস্যা থেকেই যায় কি লাভ পড়ে।

চিকিৎসার বিষয়ে এ পরিবারগুলো একেবারেই উদাসীন এ ব্যাপারে অর্থ ব্যয়ের সামর্থও নেই এবং স্বাস্থ্য সচেতনতাও তেমন নেই। ২/১ জন বলেছে বড় ধরণের কোন অসুখ হলে তারা পটুয়াখালী সদর হাসপাতালে যান।

আমি এ দশটি পরিবারের নারীদের সংগে এ সমস্ত বিষয়ে কথা বলার পরও দুজন মহিলার সংগে তাদের জীবনধারার বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ ভাবনা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেছি। বিশেষত আশা'র ঋণ প্রোগ্রামের সংগে যুক্ত হওয়ার পরের বিষয়াবলীর উপর গুরুত্ব দিয়েছি।

কেসস্টাডি — ১

অবহেলিত নারী/আশা/বর্তমান অবস্থা

রিজিয়া বেগম। বয়স পঁয়ত্রিশ। স্বামীর নাম আব্দুল হক হাওলাদার। বসবাস করেন রাজ্জাক হাওলাদারের বাড়ী স্বীয় বন্ধকী ভিটায়। তার চার মেয়ে তিন ছেলে। বড় ছেলের বয়স ২০ বৎসর এবং পরবর্তী মেয়ের বয়স আঠার বৎসর। চার মেয়ে যাথাক্রমে চৌদ্দ, বার, সাত ও আট বছর। পরবর্তী দু'ছেলে ও এক মেয়ে চার, তিন ও দেড় বছর বয়সের। রিজিয়া বেগম সোনালী ভূমিহীন সমিতির সদস্যা।

রিজিয়া বেগম জানান তার বিয়ে হয়েছে দশ/বার বছর বয়সে। স্বামীর সংসারে প্রথম জীবন থেকেই সে স্বামী শ্বশুর, শাশুড়ী কর্তৃক অত্যাচারিত হত। তার স্বামী অক্ষম প্রকৃতির বলে কাজকর্ম করত না– এর জন্য তাকে দায়ী করা হত। প্রায়ই বাবার বাড়ী পাঠিয়ে দেয়া হত। পিতা জীবিত থাকাকালীন সময় তার স্বামীকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করত। কিন্তু তার স্বামী কিছু করে খাবার মত ব্যবস্থা করতে পারেনি। বরং শ্বশুরের মৃত্যুর পর দেড় বিঘা জমি (তিন বিঘা জমি ছিল) তাকে না জানিয়ে বিক্রী করে দিয়েছে। ভিটাবাড়ীও টিপসই দিয়ে চেয়্যারম্যানের কাছে বন্ধক রেখেছে। বর্তমানে চেয়্যারম্যান চাপ প্রয়োগ করছে বাড়ী ছেড়ে দিতে নয়তবা টাকা দিতে। তার ধারণা আশা থেকে ঋণ প্রাপ্তির ফলেই এটি ঘটেছে। রিজিয়া বেগম বলেন যে খেয়ে পরে এমন টাকা তার হাতে থাকে না সে বাড়ীর টাকা ফেরৎ দিবে। আর বাড়ী ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র থাকার মত অবস্থাও তার নেই। তার সংসারে বিভিন্ন রকম ঝামেলা রয়েছে। বড় মেয়ে মেট্রিক পাশ করেছিল। বিয়ে দেবার পর যৌতুক দিতে না পারায় মেয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকে ফেরৎ এসেছে। বার হাজার টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। সে টাকার অর্ধেক বর্তমানেও অপরিশোধিত রয়েছে। বাকী টাকা তার ছেলে ঋণের টাকা থেকে কাঁচামালের ব্যবসা করে স্বল্প হারে পরিশোধ করেছে। বর্তমানে মেয়ে জামাই যৌতুক চায় পাঁচ হাজার টাকা। অথচ ঘরে তার বিবাহযোগ্য কন্যা রয়েছে। সে চায় তার মেয়ে চাকরী করুক কিন্তু জামাই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে চাকরী করলে ভবিষ্যতে মেয়েকে ঘরে তুলে নেবে না। এ নিয়ে যথেষ্ট দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। দুটো মেয়ে স্কুলে পড়ত কিন্তু সে ফিরিয়ে এনেছে কারণ পড়াবার মত সামর্থ তার নেই। তাছাড়া রিজিয়ার ধারণা পড়ালে বড় মেয়ের মত অবস্থাই হবে। শিক্ষিত মেয়েরও যৌতুক ছাড়া বিয়ে দেয়া যায় না।

তার সংসারের এহেন টানাপোড়নের মধ্যে সে আয়তুন্নেছার কাছে আশার ঋণদানের খবর পায়। সে প্রথমে ঋণ নিতে ততটা ইচ্ছুক ছিল না। কিন্তু তার স্বামী বারংবার বলাতে সে আশার ভূমিহীন সমিতির সদস্য হয়। ঋণ দিয়ে প্রথম বছর স্বামীকে দেয়। আব্দুল হক হাওলাদার ব্যবসা করবে বলে টাকা নিয়ে ব্যবসা না করে খরচ করেছে। কিন্তু কিস্তি এবং সঞ্চয়ের টাকা শোধ করতে হয়েছে তাকে। ছেলে রাজমিস্ত্রীর কাজ করে বোনের বিয়ের টাকা এবং কিস্তি শোধ করেছে। পরবর্তী বছর থেকে ছেলের হাতে টাকা দিয়েছেন। তার ছেলে দু বৎসর যাবৎ শাকসজীর ব্যবসা করছে। দ্বিতীয় বছরের টাকা দিয়ে দু'হাজার টাকা ঋণ শোধ করেছেন। পরিবারের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাবারের খরচ, কিস্তি দিয়ে আয়ের প্রবৃদ্ধি ঘটাতে তিনি সক্ষম হননি। এগারজন সদস্যের একবেলা খাবার খরচ প্রতিদিন ন্যূনতম চল্লিশ টাকা পড়ে।

রিজিয়া বেগম জানান তিনি স্বল্প খেয়েও তার পরিবারের সবাইকে বাঁচাতে চান। কেন তিনি স্বল্প খান এবং অন্যদের খাওয়ান একথা জিজ্ঞেস করতে বললেন, "সবকিছুর পর ছেলেময়ে স্বামী তৃপ্তি করে খায় এটাই শান্তি। আমরা মেয়ে মানুষ কোনরকম বাঁচলেই চলে।" রিজিয়া বেগমের ঋণের টাকায় সংসারে একবেলা খাবারের সংস্থান হচ্ছে এজন্য সে কৃতজ্ঞ আশার কাছে। ভবিষ্যতের কথা জানে না কি হবে। তবে বর্তমানে পরিবারের খাদ্য ব্যতীত জমি, কাপড়, শিক্ষা, চিকিৎসা কোনদিকে লক্ষ্য করা সম্ভব হয় না। তার পরিধানে ছিল মলিন শাড়ী। বড় মেয়েটির পরিধানে ছিল জীর্ন সালোয়ার কামিজ ও ওড়না। আর রিজিয়া বেগমের ছোট্ট $1\frac{1}{2}$ বছরের শিশুটি শীতের সকালেও ছিল শূন্য শরীরে কাপড়বিহীন।

তিনি তার ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাবার জন্য ব্যস্ত নন। যদিও তিনি অনুধাবন করেন শিক্ষা ছেলেমেয়েদের জন্য প্রয়োজন তবুও তার পক্ষে সম্ভব নয়। এ বছর বড় মেয়েকে স্বামীর ঘরে পাঠাতে তাকে তিনহাজার টাকা দিতে হবে এবং তিনি দেবেন। কারণ বিবাহিত মেয়ে ঘরে আছে বলে সমাজে সবাই তাকে উপহাস করে।

রিজিয়া বলেন আশার ঋণের টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে সে অন্তত দুবেলা খাবার ও ভিটাবাড়ীটুকু নিজের জন্য করতে পারলে নিশ্চিত হত। আশা এবং নিরাশা দুটোই তাকে তাড়া করে ফিরছে।

রিজিয়া বেগম সোনালী ভূমিহীন সমিতিতে আছেন কিন্তু দল গঠন নিয়ে তার কোন গভীর চিন্তা নেই। অন্য দশজনের কথা ভাবার মত অবকাশ তার নেই। ঋণ না পেলে সে সমিতি করত না। তার মতে এ বয়সে লেখাপড়া শিখে লাভ নেই। ট্রেনিং এর সময় আশার স্যার, আপারা অনেক ভাল কথা শুনিয়েছেন। বর্তমানেও মাঝে মাঝে বলেন। তবে তার সমস্যার কথা জানিয়ে কোন লাভ হয়নি। তাঁর মেয়ের যৌতুকের ব্যাপারে পরামর্শ চাইতে গেলে আশার স্যার তাকে বলেছেন আদালতে গিয়ে জামাইয়ের নামে নালিশ জানাতে। কিন্তু সেটা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার টাকানেই। তাছাড়া মেয়ে হয়ে আদালত, থানা পুলিশ করা শোভনীয় নয় এতে সমাজে তাকে বেপর্দা এবং বেশরম বলা হবে। এই গ্রামীণ সমাজের নিয়ম মেনেই তিনি চলতে চান। তা নাহলে একঘরে হয়ে যাবেন। অত্যন্ত বিষন্নভাবে রিজিয়া বললেন, "আপা আমরা গরীব। সমিতি করি। ঋণ পাই। দুবেলা খাবার জোটাবার চিন্তা যত বেশী অন্য সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার চিন্তা তত নেই। আমার মেয়ের গরীবের কপাল। যা হবার তাই হবে।" আশার কাছ থেকে তারা জেনেছে ধনী লোক গরীবকে ঠকায় কিন্তু কি করতে পারছে তারা? (ভূমিহীনরা)

আশার সংগে সংশ্লিষ্টতার ফলে তার অনুভূতি জানতে চাইলে তিনি বললেন আশারী ব্যাংক (আশাকে এরা ব্যাংক হিসেবে জানে) গরীবের উপকার করছে আল্লাহ্ তাদের ভাল করবেন। কিন্তু তার আক্ষেপ ঋণ দিয়ে যদি বাড়ীঘর জমিজমা নিয়ে বসবাস করা না যায় তা'লে কি লাভ। আশা সরকারের সুতরাং সরকারের উচিত তাদের মত গরীবদের আরও সাহায্য করা। পাঁচ বছর হয়ে গেলে আশা ঋণ দেয়া বন্ধ করবে– এতে অবশ্যই তার অসুবিধা হবে। অন্য কোন সংগঠন ঋণ দিলে সে নিবে। সে শুনেছিল আশার টাকায় তাদের বাড়ীঘর, জমিজমা সব হবে কিন্তু বর্তমানে তার দু'বেলা খাবার সংগ্রহ করতে হিমসিম খেতে হচ্ছে।

কেসস্টাডি ২

দরিদ্র নারী এব,ং আশার ঋণযুক্ত আয় বৃদ্ধি প্রকল্প

সুফিয়া বেগম। স্বামী মৃত ইসমাঈল হাওলাদার। বয়স পঞ্চাশ। বার বৎসর বয়সে সে স্বামীর দ্বিতীয় বউ হয়ে শ্বশুরবাড়ী আসে। তার স্বামীর বয়স তখন পয়তাল্লিশ বছর। সুফিয়ার বাবা দরিদ্র বলে তাকে বয়স্ক স্বামীর ঘরে বিবাহ দেয়। তিন মেয়ে এক ছেলে রেখে স্বামী মারা যায়। মৃত্যুর আগে সে বাড়ী কাজ করে সন্তানদের খাবারের সংস্থান করত। তার তিনটি মেয়ে বলে স্বামী তাকে সহ্য করতে পারত না। প্রায়ই চলে যেতে বলত। কিন্তু যাবার মত কোন নিরাপদ আশ্রয় তার ছিল না। ঈসমাইল হাওলাদার তিন মেয়ের বিয়ে দিয়ে যেতে পারেন নি। তিনি নিজে ছিলেন ভূমিহীন। একখন্ড বসতভিটা ছিল তার। স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েদের বিয়ের গুরু দায়িত্ব সুফিয়ার কাঁধে বর্তায়। বড় মেয়ের বিয়ের অর্থ সংস্থান করতে গিয়ে বসতভিটা বিক্রী করে দিতে হয়েছে। এরপর থেকে সে ভিক্ষা করে সংসার চালাত। ভিক্ষালব্ধ একহাজার টাকা এবং গ্রামে বিভিন্ন পরিবারের কাছে চেয়ে চিন্তে আরও একহাজার টাকা সংগ্রহ করে সে দ্বিতীয় মেয়েকে পাত্রস্থ করেছে। এরপর ভিক্ষা করেই খেয়ে না খেয়ে দিন কাটিয়েছে সন্তানদের সহ। তার তিন মেয়ে এবং সে নিজে নিরক্ষর। মাদ্রাসায়

পড়েছে সবাই। ছেলেটি ডিবুয়াপুর হাইস্কুলে ষষ্ঠশ্রেণীতে পড়ত। বর্তমানে সে স্কুলে যায় না। কারণ পড়াশুনার ব্যয় বহন করা সম্ভব হচ্ছে না।

সুফিয়া বেগম পার্শ্ববর্তী গ্রাম সারিকখালীতে ভিক্ষা করতে গিয়ে আশার সংবাদ পায়। তার টাকার খুব প্রয়োজন বলে সে গ্রামে এসে আয়তুন্নেছা ও অন্যান্য সদস্যাদের কাছে আশার খবরাখবর জেনে নেয়। পরবর্তীতে আশার গ্রুপ মিটিং এ উপস্থিত হয় এবং তিনমাস সমিতিতে যাওয়া আসা করার পর ঋণ পেয়েছে। ঋণের টাকা নিয়ে সে কি করছে, কেমন আছে ইত্যাদি প্রশ্ন করতে সুফিয়া বেগম প্রথমে কোন জবাব দিতে চায়নি। পরবর্তীতে বলেছে সে কোন ব্যবসা বাণিজ্য করেনি। প্রথম বছরের টাকা ঘরের মেরামতে ব্যয় করেছে। সংসার খরচেও লাগিয়েছে। পরবর্তীতে ভিক্ষা করে কিস্তির টাকা শোধ করেছে। সম্পূর্ণ টাকা এক বছরে শোধ করেনি। এ বছরও (৯৪) কিছু শোধ করেছে। সে জানে আশার প্রাপ্ত টাকা তাকে পরিশোধ করতেই হবে। ঋনের টাকা নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য না করার পেছনে কোন কারণ আছে কিনা জানতে চাইলে জানাল ব্যবসা করে দেবার মত উপযুক্ত কোন সদস্য তার সংসারে নেই। ছেলে ছোট। মেয়ে জামাইদেরকেও বিশ্বাস করতে ভয় পায়। যদি টাকা খরচ হয়ে যায় তা'লে সে শোধ করবে কিভাবে। হাঁস-মুরগী পালন কিংবা শাকশব্জী উৎপাদন করা তার পক্ষে সম্ভব কিন্তু এগুলো বাজারজাত করার জন্য তাকে অন্য কারও উপর নির্ভর হতে হবে। তার পক্ষে হাটে বাজারে যাওয়া সম্ভব নয়। সে মহিলা বলে সমাজের সবাই তাকে ধিক্কার দেবে। তার নিজেরও ইচ্ছে নেই পুরুষের মধ্যে গিয়ে কাজ করার। গ্রামে হেটে ভিক্ষা করলেও সে তার পর্দা রক্ষা করেই চলে। তার মেয়ে জামাইও এ ব্যাপারে সমর্থন দেয়নি। অথচ বর্তমানে তার অর্থের প্রয়োজন। ছেলেটির পড়াশুনার খরচ যোগাতে হবে। বিশেষত মেয়ের বিয়েতে ৬/৭ হাজার টাকা খরচের ব্যাপার আছে। বিয়ের সম্বন্ধ এলে যৌতুক বিহীন কেউ মেয়ে নেয়ার কথা বলে না। মেয়ের বয়স আঠার হয়ে গেছে। এখনই বিয়ে দিতে না পারলে বয়স বেড়ে গেলে গ্রামে বিয়ে দিতে সমস্যা হয়। তার অন্যান্য মেয়েদের ১৪/১৫ বছরে বিয়ে হয়ে গেছে।

সুফিয়া এ বছরের ঋনের টাকা (২,০০ টাকা মাত্র) জমা রেখেছে। সে '৯৪-এর জানুয়ারী থেকে কেয়ার এর মাটি কাটার কাজ করছে। সেখানকার মজুরীর টাকা দিয়ে সংসার চালায় ও কিস্তি শোধ করে। তার দৈনিক মজুরী ছিল বিশ টাকা।
সুফিয়া জানায় তারা একবেলা খাবার খায়। খুব সাধারণ খাবার ভাত-শাক, ভাত-বেগুন বা আলু ভর্তা, মাছ-মাংস খাবার কথা ভাবেন না। কদাচিৎ মাছ খান খান। তার বড়মেয়ের জামাই ভূমিহীন। ওদের অর্থকষ্ট অনেক বেশী। প্রায়ই সে স্বল্প অর্থ দিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করে। ভাল কাপড়চোপড় পরিধান করার সামর্থ তার নেই। ঈদ, কোরবানীতে যাকাত, দেওয়ার মাধ্যমে পরিধানের কাপড় সংগ্রহ করেন। মেয়ের পরিধেয় কাপড়, ব্লাউজ, পেটিকোট ন্যূনতম টাকায় ক্রয় করেন। দুটো কাপড় দিয়ে বছর দুয়েকও চলতে হয়। ছেলে লুঙ্গি পড়ে একটা। একটা প্যান্ট ও জামা আছে স্কুলে যাবার জন্য। ভাল খাবার, কাপড়, চিকিৎসা, টিনের বাড়ীতে বসবাসের আকাংখা থাকলেও সামর্থ নেই। তার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে সে 'আশা' ছেড়ে দিবে কারণ প্রতি সপ্তাহে কিস্তি পরিশোধ করা কষ্টকর। এ বয়সে তাকে মাটি কাটার কাজ করতে হয় কিন্তু শারীরিক শক্তি তেমন নেই। মেয়ে বড় হয়েছে তাকে এ অবস্থায় কোন কাজে দেয়া সম্ভব নয়। তা'লে হয়ত বিয়েই হবে না। ছেলেকে পড়াতে না পারলে দিনমজুরীর কাজে লাগাবে। সে আর কোন কাজ করবে না। কারণ পিতার ঘর থেকে স্বামীর ঘরে এসে আরো দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে সে ক্লান্ত। সুফিয়া মনে করে সে ভাগ্যহীনা রমনী, তা না হলে তার তিন মেয়ের পরিবর্তে ছেলে থাকত এবং তারা আয় করে খাওয়াত।

আমি তাকে বললাম আপনার এত সমস্যা আশার অফিসিয়ালদের (স্যার আপা বলতে হয়) জানান না কেন? সে বলল জানিয়েছে কিছু আবার সবকিছু জানানো সম্ভব হয় না। তারা অনেক ব্যস্ত এত কথা বলা সম্ভব নয়। আপনি ধৈর্য ধরে শুনতে চাইলেন তাই বললাম।

আশা সম্পর্কে তার ব্যাপক কোন ধারণা নেই। আশা সরকারী ব্যাংক। ঋণ দেয়। গরীব মানুষের উপকার করে। সুফিয়া মনে করে কেবল ঋণ দিয়ে সব সমস্যার সমাধান হয় না। তার জীবনে ঋণ নিয়ে সে কর্মসংস্থানের

ব্যবস্থা করতে পারছে না- কারণ সে নারী। নারীকে আল্লাহ্‌তালা পুরুষের চেয়ে কম শক্তিশালী করে সৃষ্টি করেছেন তাই পুরুষ যা পারে নারীর তো তা পারা সম্ভব নয়।

সুফিয়া নিরক্ষর। গ্রুপ মিটিং-এ যখন পড়ানো হয় তখন শোনে। এ ব্যাপারে তার আগ্রহ নেই। সে মূর্খ তার এগুলো পড়ে লাভ নেই। তার মতে সমিতিতে বিশজন একসংগে সংগঠিত হলেও এর মধ্যে যারা ভাল অবস্থানে থাকে তারা তাদের চেয়ে অধঃস্তন অংশকে হেয় করে। সুফিয়া আসার সময় আমাকে বললেন সরকার গরীবদের কেন বেশী সাহায্য করে না? আমি যেন তাদের দুঃখের কথা বেশী করে লিখি যাতে সরকার জানতে পেরে তাদের আরও সাহায্য করে।

সোনালী ও একতা ভূমিহীন সমিতির পঁচিশটি পরিবার পাওয়া গেছে যারা বর্তমানে দুবেলা খাবার সংগ্রহ করে পরিবারের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে পারছে। এদের মধ্যেই পাঁচটি পরিবারের বসতভিটা ও জমি কোনটাই নেই। দশটি পরিবারের স্বল্প পরিমাণ জমি রয়েছে। এ পরিবারগুলোর মধ্যেই নটি পরিবারের পুরুষ রিক্সা কিনে চালাচ্ছে, তিনটি পরিবার গরু কিনে দুধ বিক্রী করছে এবং বাকী পরিবারগুলো ক্ষুদে ব্যবসায় জড়িত। এখানে উল্লেখ্য গরু এবং রিক্সার মালিকরা আশার ঋণের সংগে বাড়তি কিছু ঋণ করে এগুলো ক্রয় করেছে। যদিও এতে তাদের দু'দিকের ঋণ শোধ দিতে হচ্ছে তবুও তারা ভাবছে তাদের স্থায়ী সম্পত্তি হ'ল যার মাধ্যমে আয়ের প্রবৃদ্ধি ঘটবে।

উপরোক্ত পরিবারের মহিলারা জানিয়েছে তারা দুবেলা ভাত খায়। সকালে বাসী ভাত এবং বেলা তিনটা চারটায় দুপুরের খাবার গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে তাদের কোন নিয়ম নেই। একই খাবার তারা দুপুর ও রাতেও খায়। খাবারের মেনু ভাত-ডাল, শাক বা ছোট মাছ কিংবা ডিমও খান তবে মাঝে মাঝে। মাংস খাওয়া হয় বাড়ীতে কুটুম এলে অর্থাৎ মেয়ের বা ছেলের শ্বশুর বাড়ীর কেউ এলে। দশটি পরিবার ফসল উঠলে একমাস চাল কিনে খান না। বাকী এগার মাস কিনে খেতে হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছুই তারা নগদ দামে শহরের বাজার থেকে ক্রয় করে নিয়ে আসেন।

দশটি পরিবারের খড়ের ঘর। পনেরটি পরিবারের টিনের ঘর। এদের মধ্যে আবার পাঁচ জনের চারিদিকে বাঁশের বেড়া দেয়া। ঘরের টিন অনেকেরই পুরানো হয়ে গেছে। এ পরিবারের সবার ঘরে চৌকি কিংবা খাটের ব্যবস্থা নেই। দশ জনের ঘরে চৌকি আছে। আসবাব বলতে এটাই। চেয়ার এবং টেবিল চারজনের ঘরে পাওয়া গেছে। এ পরিবার গুলোর সবাই-ই চায় মজবুত টিনের ঘরে বসবাস করতে। কারণ গ্রামে যাদের ভাল টিনের বাড়ী আছে তারা স্বচ্ছল বলে পরিচিত।

এসব পরিবারের মহিলারা ১০০ থেকে ১২০ টাকা দামের দুটো কাপড় পরিধান করেন। সবার পক্ষে সেটা সম্ভবপরও হয় না। আঠারটি পরিবারের নারীদের জীর্ন কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। ব্লাউজ এবং পেটিকোট পড়েছেন তিন/চারজন মহিলা। এরা বয়সেও তরুণ। দুজনকে দেখেছি স্যান্ডেল পরিহিত অবস্থায়। স্যান্ডেল পড়ার বিষয়টি অভ্যাসের সংগে জড়িত। গ্রামের মহিলারা পরিবেশগত কারণেই স্যান্ডেল পরতে সবাই অভ্যস্ত নন। এদের সন্তানরা একটি বা দুটি জামা পরিধান করে। বাড়ীর পুরুষরা বাড়ীর বাইরে গেলে সার্ট বা পাঞ্জাবী পরেন। একটি বস্ত্রই তারা সারাবছর পরিধান করেন। দশটি পরিবারের সদস্যা জানায় তাদের বাড়ীর পুরুষরা গেঞ্জি পরেই বাইরে যাতায়াত করেন। শার্ট বা পাঞ্জাবী তারা পরেন না। সদস্যারা জানান সবাই-ই ভাল কাপড় পড়তে ইচ্ছুক কিন্তু সামর্থ নেই। একটি ভাল কাপড় পরিধানের পরিবর্তে একবেলা বেশী খাবার কিংবা ভাল খাবার খেতে তারা আগ্রহী।

শিক্ষা এবং চিকিৎসা এ দুটো খাতকে ভূমিহীন পরিবারগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। শিক্ষার বিষয় কিছু সচেতনতা তৈরী হলেও সন্তানদের শিক্ষিত করার ব্যাপারে এরা ব্যগ্র নন। শিক্ষিত হলে ভাল কিন্তু কতটা ভাল, কি হতে পারে এ বিষয়ে ধারণা পরিষ্কার নয়। কন্যাসন্তানদের ক্ষেত্রে প্রাইমারী স্কুল অব্দি পড়াতে

পারলে সন্তুষ্ট হয়। এ পরিবারের মধ্যে তিনজন মহিলাকে পাওয়া গেছে যারা তাদের কন্যাসন্তানকে মেট্রিক পাশ অন্তত করাতে চান। এ ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যার পাশাপাশি যৌতুক সমস্যার বিষয় নিয়ে তারা চিন্তিত। তাদের মত পরিবারের মেট্রিক পাশ মেয়ের যোগ্য পাত্র পাওয়া দুষ্কর। আবার পাত্র পাওয়া গেলেও যৌতুকের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সদস্যারা জানান তারা সন্তানের চাকরীর চেয়ে বিয়েকে প্রাধান্য দেন সর্বাগ্রে। চাকরী পেলে করতে পারে তবে কতদিন করবে সেটা বিয়ের পর স্বামীর উপর নির্ভর করে। ভূমিহীন পরিবারের নারী সদস্যারা জানান গ্রামে প্রাইমারী ও হাইস্কুল আছে কিন্তু অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয় চিন্তা করে তারা সন্তানদের পড়ালেখার জোর দেন না। এদের মধ্যেই দশজনকে পাওয়া গেছে যারা পুত্র এবং কন্যা উভয়ের পড়াশুনা নিয়ে মোটেই ভাবিত নন। তাদের মতে গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরা পড়ালেখা করার চেয়ে পরিবারের কাজে সাহায্য করলে কাজে লাগে। খাওয়া পড়ার যোগান দিতে তারা হিমশিম খান– পড়ালেখার অর্থের যোগান কোথেকে দেবেন? বিশেষত মেয়েদের মসজিদ কিংবা মক্তবে আরবী পড়ালেই গ্রামে চলে যায়। বাকী সাতজনের মধ্যে ভিন্নমতও লক্ষ্য করা গেছে। পুত্রসন্তান পড়লে পড়বে কিন্তু কন্যাসন্তানের ব্যাপারটি অনিশ্চিত। এদের বয়স ১৩/১৪ বছর হলে এবং বিয়ের ভাল সম্বন্ধ পেলে অভিভাবকরা পাত্রস্থ করে ফেলেন। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত অনেকেই পড়াতে চান।

চিকিৎসার জন্য এ পরিবারগুলো হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী এবং পানিপড়া, ফুঁ এসবের উপর নির্ভর করেন। সাধারণতঃ জ্বর, আমাশয় সর্দি হলে এরা তেমন গুরুত্ব দেন না। বেশীদিন অতিবাহিত হলে মসজিদের ইমামের কাছ থেকে পানি পড়া ও ফুঁ নেন। এছাড়াও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও করান। এতে ডাক্তারের কাছে গিয়ে উপসর্গ বললে ঔষধ পাওয়া যায়। আবার মাঝে মাঝে ফার্মেসী থেকে অসুখের নাম বলে ঔষধ কিনে নেয়। ডাক্তারের ফি অনেক। হাসপাতালে গরীবদের চিকিৎসা করানো হয় তবে তারা যান না। ছটি পরিবারের নারী জানিয়েছে বড় ধরণের কাঁটাছেঁড়া, দীর্ঘদিনের অসুস্থতা হলে তারা সদর হাসপাতালে যান। একজন গর্ভবতী নারীর শারীরিক অবস্থা জটিল আকার ধারণ না করা পর্যন্ত যান না। শিশুদের বেলায়ও ব্যতিক্রম নেই। এক্ষেত্রে তাদের আর্থিক সঙ্গতির বিষয়টি ছাড়াও দীর্ঘদিনের অনভ্যস্ততার বিষয় রয়েছে। বয়সে তরুন মহিলারা বলেছে তারা বাচ্চার অসুস্থতা হলে ডাক্তারের কাছে যান। এদের সংখ্যা বেশী নয়। চারজন হবে।

আমি উপরোক্ত পঁচিশটি পরিবারের মধ্যে দুটি পরিবারের দুজন নারীর কেসস্টাডি নিয়েছে। প্রথম নারীর বেলায় দেখা গেছে একজন নারী তার চরম দারিদ্রের মধ্যেও বেঁচে থাকার মানসে অবিরত লড়াই করেছেন পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার সঙ্গে। আত্মনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে তার প্রচেষ্টা উল্লেখ করার মত। কিন্তু প্রচেষ্টা অনুসারে তার সাফল্য এবং প্রাপ্তি দুটোরই যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে।

আশার ঋণ নিয়ে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনয়নের চেষ্টা করলেও কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন সে করতে পারেনি। পিতৃতন্ত্র, লিঙ্গীয় শ্রম বিভাজন নারী বলে বারংবার অপমান এবং আঘাতের মাধ্যমে তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ছোটখাট প্রতিবাদও সে করেছে এসবের বিরুদ্ধে কিন্তু অধিকার ও মর্যাদা তার করতলগত হয়নি। নিম্নে তার জীবনের অতীত, আশার সংগে সংশ্লিষ্টতার পর বর্তমান অবস্থান, ভবিষ্যত ভাবনা বিস্তারিতভাবে বিবৃত করা হ'ল ঃ

কেসস্টাডি ৩

নিপীড়িত নারী, তার স্বনির্ভরতার প্রচেষ্টা এবং বৈদেশিক সাহায্য

আয়তুন্নেছা বেগম। বয়স আটচল্লিশ (৪৮)। স্বামী মৃত। আয়তুন্নেছা সোনালী ভূমিহীন সমিতির সভানেত্রী। তার স্বামী মৃত। পাঁচ মেয়ে এক ছেলে রেখে বার বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন। আয়তুন্নেছার স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে তার জীবনে নেমে আসে দু:খ কষ্ট এবং দারিদ্রের কষাঘাত। তার স্বামী রোগ ব্যধিতে ভূগে কর্মহীন হয়ে পড়ায় জীবিত অবস্থায় দুই (২) বিঘা জমি বিক্রী করতে বাধ্য হয়। তার মৃত্যুর পর ঋণের দায়ে দেড় ($১\frac{১}{২}$)

বিঘা জমি ছেড়ে দিতে হয়েছে পাওনাদারকে। মূলত: স্বামীর মৃত্যুর পর নিকটাত্মীয়দের মধ্যেই কেউ কেউ তাকে প্রতারণা করে কৌশলে জমি নিয়ে গেছে। আয়তুন্নেছা আত্মীয়ের নাম জানাতে অস্বীকার করেন। তিনি বর্তমানে তার শত্রু বাড়াতে চান না। এর দু'বৎসর পরে চৌদ্দ শতাংশ জমি বিক্রী করে বড় মেয়ের বিয়ে দেন পার্শ্ববর্তী আউলিয়াপুর গ্রামে। তখন থেকেই শুরু হয় তার মানবেতর জীবনযাপন। তিন মেয়ে এক ছেলে নিয়ে প্রায়ই অনাহারে থাকতে হত। ছোট ছেলেটিকে নিয়ে বিলে ঝিলে মাছ ধরে থানকুনি পাতা তুলে বাজারে বিক্রী করে কোনদিন একবেলা খাবার সংগ্রহ হত, কোনদিন হত না। দিনের পর দিন তাকে শাকপাতা সিদ্ধ, আটার জাউ খেতে হয়েছে। সন্তানদের নিয়ে অবর্ননীয় দু:খ সত্বেও সে কারও কাছে মাথা নত করে ভিক্ষা চায়নি। তার সম্বল ছিল ভিটাবাড়ীর উপর একখানা বাড়ী। গ্রামের লোকজন এবং জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা প্রায়ই বলত স্বামী যখন নেই তখন সন্তানদের নিয়ে বাবার বাড়ী চলে গেলেই ভাল। কিন্তু সে যায়নি কোথাও। ছেলেমেয়েদের নিয়ে অন্য কারও দ্বারস্থ হতে তার মন সায় দেয়নি। (কথা বলার সময় আয়তুন্নেছা কাঁদছিল) ছেলেমেয়েকেও সে তার মত করেই বুঝিয়েছে। এরিমধ্যে ১৯৮৫ সালে কেয়ার গ্রামে রাস্তাবাধার কাজে নারী ও পুরুষ উভয়কেই মজুরী শ্রমিকের জন্য ডাকে। আয়তুন্নেছা তখন একমাত্র মহিলা যে মাটি কাটার কাজে যোগ দেয়। বাড়ীর বয়জ্যেষ্ঠরা তাকে নানাভাবে কটুক্তি করে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছে– সবাই মিলে শালিস বসিয়েছে। তাকে গ্রামে অনেকেই বেপর্দা বলে গালি দিয়েছে। আয়তুন্নেছা তবুও কাজে গিয়েছে। যারা তাকে নিয়ে সালিশ ডেকেছে তাদের বলেছে আমার সন্তানদেরসহ খাবারের ব্যবস্থা করলে আমি কাজ করবো না। এটা যেহেতু কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি তাই তাকে পিছনে ভৎর্সনা করলেও কেউ আর পূর্বের মত কাজ বন্ধ করার তাগিদ দেয়নি। এতসব প্রতিকূলতার মধ্যে ১৯৮৬ সালে আয়তুন্নেছার বড় মেয়ে শ্বশুর বাড়ী থেকে ফেরৎ আসে। জামাই নগদ টাকা যৌতুক হিসেবে দাবী করে। জামাইকে কিছুদিন পর টাকা দেবে বলে মেয়েসহ ফেরৎ পাঠায়। এরপর আবার একবছর পর একটি পুত্রসন্তানসহ মেয়ে ঘরে ফিরে আসে। সাথে স্বামীর অত্যাচারের চিহ্ন শরীরে। তারপর মেয়েকে আর ফেরৎ পাঠায়নি। পরবর্তীতে জামাই এসে প্রায়ই টাকা চেয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু মেয়েকে নেয়ার কোন উদ্যোগ নেয়নি। তার অভাবের সংসারে দু'জন মানুষের আগমন সংসারটাকে আরও বিপদের মধ্যে ফেলেছে। নাতির বয়স সাত বছর। মেয়ে চায় ঢাকা গিয়ে গার্মেন্টসে কাজ করতে। সে আর স্বামীর ঘরে ফিরে যাবে না।

জীবনের এ টানাপোড়নের মধ্যে ১৯৯০ সনে সে আশার সংবাদ পায় এবং সোনালী ভূমিহীন সমিতিতে যোগ দেয়। সে জানায় "অন্য কোন কারণ নয় ঋণের মাধ্যমে টাকা পাব, নিজের পায়ে দাড়াব, শান্তিতে দুবেলা ভাত খাব এ আশায় সমিতিতে যোগ দিয়েছিল।" এ পর্য্যন্ত চারবার ঋণ নিয়েছে আশা থেকে। প্রথম বছর একহাজার টাকা দিয়ে চাল কিনেছে। দ্বিতীয় বছর তার ছেলে পাঁচশত টাকা নিয়ে শাকসব্জীর ব্যবসা করেছে এবং বাকী দেড়হাজার টাকা দিয়ে কিছু ঋণ শোধ করেছে। তৃতীয় বছর তার মেয়ে জামাইকে তিনহাজার টাকা দিয়েছে– সে ফেরৎ দিবে বললেও আর ফেরৎ দেয়নি। ঐ টাকার কিস্তি সে বর্তমানেও পরিশোধ করছে। চতুর্থ বছর ঋণ নিয়ে দশ কাঠা জমি কিনেছে। সে ভেবেছিল কেয়ার এর মজুরী থেকে কিস্তি শোধ করবে, কিন্তু এ বছরই তাকে (১৯৯৪) কেয়ার এর কাজ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। কারণ হিসেবে জানা যায় গ্রামে চেয়্যারম্যান এবং মেম্বাররা মহিলা শ্রমিকদের কাছে টাকা দাবী করে (বিশেষত যারা আশা থেকে ঋণ নেয়) এবং টাকা না পেলে কাজ থেকে বিমুক্ত করা হবে বলে জানানো হয়। আয়তুন্নেছা জানায় তারা পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে শ্রম বেশী দিত এবং কাজও পরিমাণে বেশী করত। পুরুষরা প্রায়ই গল্প গুজব করে ফাঁকি দিয়েছে কিন্তু মজুরীর বেলায় নারী শ্রমিকদের কোন সুবিধা প্রদান করা হয়নি। তারা তিনজননারী শ্রমিক মিলে বারশত টাকা চেয়্যারম্যানের কাছে জমা দেয়ার পরও তাদেরকে কাজ থেকে বাদ দেয়া হয়। এতে পুরুষ শ্রমিকরা কোন প্রতিবাদ করেনি বরং চেয়্যারম্যানকেবলে নিজেদের লোককে কাজে লাগিয়েছে। এ ব্যাপারে আশা এবং কেয়ারকে জানানো হলেও কোন সদুত্তর মেলেনি। আশার স্যারের কাছে পরামর্শ চেয়েছিল তার করণীয় কি হতে পারে সে ব্যাপারে। তিনি কেয়ার এর সাথে যোগাযোগ করতে বলে বিষয়টি সম্পর্কে আর কোন বক্তব্য দেননি বা পরামর্শও নয়।

আয়তুন্নেচ্ছা জানায় 'আশা' থেকে ঋণ নিয়ে বর্তমানে সে দুবেলা খেতে পারছে। কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে এ নিয়ে ভাবতে পারছে না। পরিবারে সাতজন সদস্যের দুবেলা খাবারের যোগান দিতে তার প্রতিদিন ন্যূনতম

৭০/৮০ টাকার মত খরচ হয়ে যায়। দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ের জন্য স্বল্প টাকা সঞ্চয় করার চেষ্টা করছে। কিস্তির টাকাও নিয়মিত পরিশোধ করার চেষ্টা করে। তার ছেলে ছোটখাট কাঁচামালের ব্যবসা করে সংসারটাকে কোনরকম চালিয়ে নিচ্ছে। সে এবার দশকাঠা জমি কিনেছে কিন্তু চাষ দিতে পারেনি। ছেলেমেয়েদের কাপড়চোপড় খাতে এবছর তাকে বেশ কিছু (পাঁচশত হবে) টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ সে নিজে এবং ছেলেমেয়েরা ছেঁড়াখোঁড়া একটি কাপড় পরে কাটিয়েছে। উন্নতমমানের কাপড় সে তার সন্তানদের দিতে পারেনি– কোনরকম আব্রু রক্ষা করা যায় এমন কাপড়চোপড়ই সে কিনেছে। শিক্ষা এবং চিকিৎসা এ দুটো খাতে সে কোন টাকা ব্যয় করতে পারে না। তার কোন মেয়েকেই আয়তুন্নেছা পড়ায়নি। ছেলেকেও নয়। পড়ালেখা করাবার কথা ভাবার মত অবকাশ তার ছিল না। কাপড়চোপড়ের অভাবে মেয়েদেরকে ঘর থেকে বেরুতে দেয়নি। আয়তুন্নেছা লেখাপড়া করানোকে তার জন্য বিলাসিতা মনেকরে। সে এত দরিদ্র দুবেলা খাবারের সংস্থানের পর লেখপড়ার কথা ভাবতে পারে না। মেয়েদের লেখাপড়া করিয়ে কোন লাভ নেই। বিয়ে দিতে হয়– যৌতুকও দিতে হয় দুদিকের খরচ করবার মত সামর্থ তার নেই।

আয়তুন্নেছার কাছে আশা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জনতে চাইলে যেমন আশা সম্পর্কে তার ধারণা, আশার টাকার উৎস, ঋণদান পরিস্থিতি, দলগঠন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়। সে প্রথমেই বলল আশা তাদের ঋণের মাধ্যমে টাকা দিয়ে সাহায্য করছে সুতরাং আশা ভাল। পূর্বে গ্রামে কারও কাছ থেকে ঋণ পেতে হলে একশত টাকায় দশ টাকা সুদ দিতে হত, এতে একসময় সুদের পরিমাণ এত বেশী বাড়ত একজন গরীব লোকের পক্ষে তা শোধ করা অসম্ভব হয়ে যেত। টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে হৃতসর্বস্ব হতে হত। আশার ঋণের কিস্তি শোধ করতে তদের কষ্ট হলেও টাকা পরিশোধ হয়ে যাচ্ছে অন্তত এ স্বান্তনাটুকু থাকে। আশাকে আয়তুন্নেছা ব্যাংক হিসেবেই জানে। সে এও জানে আশাকে বিদেশীরা টাকা দেয় গরীবের উপকার করার জন্য। এ কথা প্রশিক্ষণের সময় শুনেছ। আয়তুন্নেছা জানায় তারা কতটকু ঋণ পাবে, কবে পাবে, কখন শোধ করা হবে, কিভাবে শোধ করা হবে এসব ক্ষেত্রে আশাই সিদ্ধান্ত নেয়। সদস্যরা এ ব্যাপারে কোন মতামত জ্ঞাপন করে না। তারা ঋণ নিয়ে কে কি করছেন এ ব্যাপাবে আশা ওয়াকিবহাল নয়। তার ধারণা এ বিষয় জানা থাকলে ঋণ নিয়ে তাদেরকে বিভিন্নমুখী সমস্যায় পড়তে হত না। যেমন ঋণ নিয়ে তার নির্দিষ্ট কিছু করার ইচ্ছা থাকলেও সে করতে পারছে না। তদুপরি দীর্ঘদিনের দারিদ্রতার পর এত স্বল্প ঋণ ভোগেই খরচ হয়ে যায়। তার মতে আশার উচিত আরো বেশী পরিমাণ বেশী সময় ঋণ প্রদান করা তা'লে তারা হয়তবা তিনবেলা খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারত। তবুও সে হতাশাগ্রস্ত নয়– জানায় আশা ঋণ দেয়া বন্ধ করলেও অবস্থা পূর্বের মত হবে না। তাছাড়া আল্লাহ্ আছে সুতরাং না খেয়ে থাকতে হবে না।

আয়তুন্নেছা ঋণ নেয়া ও ফেরৎ প্রদান ব্যতীত অন্য ব্যপারে আগ্রহ প্রকাশ করে নি। দলগঠন, শিক্ষা এসব ব্যাপারে সে অনীহা প্রকাশ করেছে। তার নিজের অনেক সমস্যা– সেসব নিয়ে তাকে সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ থাকতে হয়। আশা যতদিন আছে তারা সবাই আছে। আশা ঋণ দেয়া বন্ধ করে চলে গেলে যে যার মত হয়ে যাবে।

আমি আয়তুন্নেছার বাড়ীতে যেদিন প্রথম গিয়ে খোঁজ নিয়েছিলম সেদিন সে আমার সাথে বেশ অবহেলা এবং অবজ্ঞার সাথে কথা বলছিল। কিছু বলতে গিয়ে একনাগাড়ে অনেককিছু বলে ফেলছিল। এক পর্যায় আমাকে বলেছিল কি হবে আপনাকে আমাদের কথা বললে? কি উপকার করবেন ইত্যাদি। আমি বলেছিলাম শুনবো অত:পর লিখবো। এটাও বলেছিলাম সে আশার সভানেত্রী সে যদি কথা বা বলে তাহলে অন্য যারা তারাই বা কেন আগ্রহ প্রকাশ করবে? এর পরে সে আমার সাথে প্রচুর কথা বলেছিল। শেষে বলেছিল আমি যেন তাদের কথা এমন করে লিখি যাতে সরকার কিংবা বিদেশী যারাই হোক তাদের আরও বেশী করে সাহায্য করে। তাদের মত ভূমিহীন এবং নি:স্ব পরিবারের যাতে পাকা ঘর বাড়ী, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, টিউবওয়েল ইত্যাদি হয়। আমি কোন প্রতিশ্রুতি দেইনি কারণ প্রতিশ্রুতি দেবার কাজ আমার নয়। আসলে বসাকবাজার ইউনিটের তত্ত্বাবধায়ক ওদের বলেছিলেন আমাকে ভাল করে নিজেদের দু:খ কষ্টের কথা বলতে– তা'লে আমি লিখবো এবং বিদেশ থেকে বেশী করে সাহায্য আসবে।

কেসস্টাডি ৪

নির্যাতিত এবং প্রতিবাদহীন রমনী ও আশার ঋণ

দুবেলা খাবার গ্রহণকারী পরিবারের আর একজন রমনী। পারিবারিক বলয়ে তিনি নির্যাতিত। ঋণকে কেন্দ্র করে তার পারিবারিক সমস্যা বেড়েছে কিন্তু সে কোন প্রতিবাদ জানাচ্ছে না। পরিবারের সবার সুখের জন্য সবকিছুই ভাগ্য বলে মেনে নিচ্ছে।

ইলিয়া বেগম। বয়স আটত্রিশ। স্বামী জীবিত। নাম আজিজ হাওলাদার। (উল্লেখ্য মহিলারা নিজের মুখে স্বামীর নাম উচ্চারণ করেনি অন্যজনকে দিয়ে বলিয়েছে) তিনি চার বছর যাবৎ এক ভূমিহীন সমিতির সদস্যা। তার স্বামী এবং সে উভয়েই নিরক্ষর। তাদের ছয়মেয়ে এক ছেলে। মেয়েরা তিনজন বড়, এরপর এক ছেলে এবঙ সর্বশেষে রয়েছে তিনি মেয়ে। মেয়েদের মধ্যে দু'মেয়ে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে আর পড়ছে না। এক মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন দু'বৎসর যাবৎ। তাকে বর্তমানেও শ্বশুরবাড়ী পাঠানো যায়নি। জামাই প্রায়শই শ্বশুরবাড়ী অবস্থান করেন। তার মেয়ের এক বছরের একটি শিশুসন্তান আছে। ডিবুয়াপুর গ্রামে নিয়ম প্রচলিত আছে পিত্রালয় অবস্থানকালীন সময় প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তাকে উপঢৌকন দিতে হয়। ইলিয়া বেগম উঢৌকন হিসেবে একটি গরু দিতে চান। সেজন্য মেয়েকে পাঠাতে পারছেন না। শ্বশুরবাড়ীতে এ নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে বলেই তারা এ ধরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার তৃতীয় মেয়ে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর আর স্কুলে পাঠানো হয়নি। বর্তমানে শুধু ছেলেটি সপ্তম শ্রেনীতে পড়ছে। যদি পারে ছেলেকে আরও পড়াবে। অন্তত:মেট্রিক পাশ করাবে।

ইলিয়া বেগম স্বামীর সংসারে এসেছে বার বৎসর বয়সে। শ্বশুরের সময়কালে তাদের কিছু জমি ছিল। বর্তমানে মাত্র সাড়ে সাত কাঠা ($৭\frac{১}{২}$ কাঠা) জমি আছে। স্বামী দীর্ঘদিন দিনমজুর ছিল। কখনো ঘরামি, কখনো বা ক্ষেতের যোগানদার। কোন নির্দিষ্ট পেশা তার ছিল না। এতগুলো মানুষের সংসার টানাপোড়নের মধ্য দিয়ে চলত। শ্বশুর শাশুড়ী বেঁচে থাকতে সংসারের দায়দায়িত্ব তাদের কাছে ছিল। সে সময় ছিল ইলিয়া বেগমের জন্য দু:সময়। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জন্য পরিশ্রম করলেও তার প্রাপ্তি ছিল শূণ্যের কোঠায়। তার চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ছিল না। এমনকি খাবার বেলায় সে যথেষ্ট প্রতারিত হত। শাশুড়ী বলতেন, "ঘরের বউ কম খেলে শ্রীলক্ষী বৃদ্ধি পায়- বেশী খেলে সংসারের মুখ বড় হয়ে যায়।" ইলিয়া বেগমের স্বামীও তার প্রতি মনোযোগী ছিলেন না। তাই তার প্রতি নির্দয় আচরণ করতে কারো অসুবিধা হত না। ইলিয়া বেগম সবসময় সহ্য করতে পারতেন না বলে প্রায়শ:ই চুরি করে খাবার খেতেন। ধরা পড়ে গিয়ে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ শুনতেন। তার সবচেয়ে বেশী সমস্যা হত সন্তান প্রসবের পর। গ্রামের নিয়মানুযায়ী স্বল্প পরিমাণ খাবার দেয়া হত। এসব ব্যাপার নিয়ে শ্বশুর কিংবা শাশুড়ী অভিযোগ করলে স্বামী তাকে মারধোর করত। এ পরিবারে আসা অব্দি ইলিয়া বেগম মানসিক শান্তি পান নি। প্রায়ই তার মনে হত সংসার ছেড়ে চলে যাবার কথা কিন্তু যেতে পারেননি। সন্তানদের তীব্র মায়া তাকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেধে রেখেছে। তার পিতার স্বচ্ছল গৃহস্থালী ছিল বলে প্রায়ই তাকে নিয়ে যাবার জন্য আসত। সে-ই নানাভাবে ফিরিয়ে দিত। শ্বশুরের মৃত্যুর পর সংসারের দায়িত্ব আজিজ হাওলাদারের নিয়ন্ত্রণে আসে। সংসারের আয়, ব্যয়, সঞ্চয় সব তার স্বামীই বহন করে আসছিল। স্বামীর সংসারে সে স্বাচ্ছন্দ দেখেনি। দিনমজুর স্বামীর পক্ষে এতবড় সংসার স্বচ্ছলভাবে চালিয়ে নেয়া সম্ভব ছিল না। সময়ের সাথে সাথে পরিবারের আকার বড় হয়েছে সমস্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তার স্বামী কাজ পেলে খাদ্যের সংস্থান হত নয়তবা হত না। বর্ষার সময় তাদের উপোস করেই কাটাতে হত। ঐ সময় তেমন কাজ মিলত না। গ্রামেও অভাব দেখা দিত। আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে কিছুদিন চললেও দীর্ঘ সময় দুর্দশার মধ্যে কাটত।

আজিজ হাওলাদারই আশার ঋণ প্রদানের খবর সংগ্রহ করে আনে। স্ত্রীকে আশার সদস্য হয়ে ঋন আনার জন্য অনুরোধ জানায়। তাকে বার বারই জানিয়ে দেয়া হয় টাকা পেলে যেন তার হাতে পৌঁছানো হয়। ইলিয়া বেগম

প্রথম পর্যায় ঋণ নিতে অনিচ্ছুক ছিল কারণ- শোধ করতে না পারলে শেষ সম্বল ভিটাবাড়ীটুকু হারাতে হবে এ আশংকায় কিন্তুতার স্বামীর অত্যন্ত আগ্রহের কারনে আশার ভূমিহীন সমিতির সদস্য হয়েছে এবং পরবর্তীতে ঋণের টাকা স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছে। ইলিয়া বেগমের ইচ্ছা ছিল বাড়ীতে হাঁসমুরগী পালন করবে কিন্তু তার স্বামী কি সব ব্যবসা করে চারবছরের মাথায় ঋণ নিয়ে গরু কিনেছে। গরুর দুধ বিক্রীর টাকা দিয়ে সংসারে দুবেলা খাবার আসছে কিস্তি শোধ হচ্ছে। এর মধ্যে বিপত্তি হয়েছে তার মেয়ে এবং জামাই উভয়েই তাদের একমাত্র সম্বল গাভীটি ছেলের উপঢৌকন হিসেবে নিতে চায়। তার স্বামী কোনক্রমেই রাজী নন। কারণ এটি হারালে তাদের সংসারের চাকা অচল হয়ে যাবে। এদিকে দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ দেখতে হচ্ছে। বলেছিলাম আপনারা সমিতির সবাই মিলে যৌতুকের জন্য প্রতিবাদ করেন না কেন? ইলিয়া জানালেন যার ঘরে মেয়ে তারই এ সমস্যা আছে। যৌতুক দিতে গিয়ে অভিভাবকরা সর্বস্বান্ত হয়ে বিপদগ্রস্ত হন কিন্তু দিতে হচ্ছে। যৌতুকের বিরুদ্ধে কেউ-ই উচ্চবাচ্য করে না। এটা তাদের গ্রামীন সমাজের স্বাভাবিক ব্যাপার। আশাকে তারা এ বিষয় জানিয়েছে কিনা জানতে চাইলে বললেন তারা আইন আদালতের কথা বলে আমাদের দ্বারা ওগুলো সম্ভব নয়। আমরা গরীব এবং মূর্খ্য মানুষ বিধায় বিপদে পড়বো।

ইলিয়া বেগম জানান ঋণের টাকায় তারা পুষ্টিকর খাবার, উন্নতমানের কাপড়চোপড়, টিনের মজবুত গৃহ, শিক্ষা, চিকিৎসা এসব সমস্যার সমাধান করতে পারেন না। আপাতত দুবেলা ভাত খেতে পারছেন। দুবেলা খাবারের পর তারা মেয়ের বিয়ের যৌতুকের টাকা সঞ্চয় করেন। (উল্লেখ্য প্রতিটি পরিবার যৌতুকের জন্য দায়বদ্ধ হলেও মেয়ের দেনমোহরের ব্যাপারে কেউ সচেষ্ট নন। দেনমোহরের জন্য পীড়াপীড়ি করলে বিয়েই ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। অনেকের এ ব্যাপারে সচেতনতাই তৈরী হয়নি।) ঋণ নিয়ে তাদের আয়ের যথেষ্ট প্রবৃদ্ধি না ঘটলেও একটি গাভী কিনতে পেরেছেন এটাই স্বান্তনা। গাভীকে তারা উৎপাদনক্ষম সম্পত্তির মতই মনে করেন। কারণ শহরে গরুর দুধের দাম বেশী হলেও ক্রেতা পাওয়া যায় ইলিয়া বেগমের সমস্যা হ'ল এ বছর তার স্বামী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আগামী সনের ঋণের টাকা এবং গ্রামের বিত্তশালী কারও কাছ থেকে কিছু টাকা ঋণ করে আবাদী জমি ক্রয় করবেন। এতে সে শঙ্কিত। কারণ দুদিকের ঋণ শোধ করতে গিয়ে যদি আবার তাকে সন্তানসন্ততি সহ অনাহারে থাকতে হয়। কিন্তু সে জানে তার স্বামী নাছোড়বান্দা। তার ভয় ভিটাবাড়ী নিয়ে। এটা হারালে সে নিঃস্ব হয়ে যাবে। আজিজ হাওলাদারকে জানিয়ে ছিল এ বছর সে সমিতি ছেড়ে দিবে কিন্তু সম্ভব হয়নি। এখন সে সবকিছুই ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছে। তার স্বামী যা ভাল বোঝেন তাই করবেন।

আমি তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম বাড়ীর বাইরে নারী পুরুষ মিলে মাটি কাটার কাজ করতে চাইলে তার স্বামী কি তাকে দিবেন? তার ধারণা অর্থের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও দেবেন না। কারণ এর পূর্বে দারিদ্রের মধ্যে থাকলেও তার স্বামী তাকে কোথাও কাজ করার জন্য যেতে দেয়নি। 'আশা'র ভূমিহীন সমিতিতে শুধু মহিলারা গৃহের অভ্যন্তরে একত্রিত হন এখানে পর্দা বজায় রেখেই চলা যায় সুতরাং এই সমিতিতে উপস্থিত হতে কোন বাধা নেই।

ইলিয়া বেগম জানান কেবলমাত্র ঋণের আশায়ই তিনি একতা ভূমিহীন সমিতিতে যোগ দিয়েছেন। আশা সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। তবে আশা শুধু গরীবদের ঋণ দেয় এটা বোঝে। সদস্যাদের মধ্যে ঋণ শোধ করতে না পারা, বেশী ঋণ চাওয়া এসব সমস্যা নিয়েই আশার কর্মীদের সাথে আলাপ আলোচনা করতে দেখেছে। সে নিজে কখনোই তার পারিবারিক কোন সমস্যার কথা আশাকে জানায়নি।

ইলিয়া বেগম আশার ঋণ কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন। তিনি তার নাম লেখা শিখেছিলেন কিন্তু বর্তমানে পারেন না- ভুলে গেছেন। লেখাপড়া সম্পর্কে তার আগ্রহ থাকলেও এ বয়সে আর হয়ে উঠছে না। সংসার জীবনের চিন্তাভাবনার মধ্যে ভাল কোন চিন্তা করার সুযোগ কোথায়? তার মনে হয় আশার কর্মীরাও প্রথমদিকে যেমন তোড়জোড় করতেন সব ব্যাপারে বর্তমানে তেমন নেই। তিনি মনে করেন ভূমিহীন সমিতির মাধ্যমে দল গঠন ঋণ আদান প্রদানের স্বার্থেই করা হয় এর বেশী তার অন্যকিছু জানা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

অধিক ঋণ প্রাপ্তির ব্যাপারে ইলিয়ার তেমন কোন আগ্রহ নেই। আশা ঋণ দেয়া বন্ধ করলে তিনিও নেবেন না। খুব বড় কোন অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। তবে শেষে বললেন আশা অনেক গরীবের উপকার করছে সুতরাং আশা গরীবের বন্ধু।

সোনালী ও একতা ভূমিহীন সমিতির পাঁচটি পরিবার পাওয়া গেছে

যারা চল্লিশটি পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে ভাল অবস্থানে রয়েছে। এদের সবার পূর্বের কিছু জমি আছে। পরবর্তীতে আশার ঋণ প্রাপ্তির পর ব্যবসা করে কিংবা টাকাকে পুঁজি হিসেবে খাটিয়ে একটি পরিবার রিক্সা ও একটি পরিবার গাভী ক্রয় করে দুধ বিক্রী করছে। বাকী তিনটির মধ্যে একটি ধানচালের ব্যবসা করছে, অন্য দুটি পরিবার স্বল্প জমিতে চাষ দিচ্ছে।

উপরোক্ত পরিবারের নারীরা জানায় পূর্বের চেয়ে তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুটা ভাল। তারা কিছু জমি ক্রয় করতে পারলে ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিন্ত হত। পরিবারগুলো বর্তমানে তিনবেলা ভাত খাচ্ছে। তাদের মেনু সকালে পান্তা; মরিচপোড়া কিংবা বাসী ডাল। দুপুরে ভাত। শাকসব্জী, ভাত ডাল। মাছ খায় সপ্তাহে একদিন। মাংস মেহমান এলেই খাওয়া হয়। এ পরিবারগুলো খাদ্যের পিছনে যত টাকা খরচ করে অন্য কোন খাতে ততটা করে না। ঘরে চালের সংস্থান হলেই এরা সন্তুষ্ট।

ভূমিহীন সমিতির পাঁচটি পরিবারের তিনজনের নতুন মজবুত টিনের ঘর। ঘরে আসবাব বলতে খাট সদৃশ চৌকি, টেবিল, ২টি করে চেয়ার দেখা গেছে। তবে সবারই মাটির মেঝে। এদের পরিবারে অন্য পরিবারের তুলনায় কিছুটা স্বচ্ছলতার চিহ্ন রয়েছে। যেমন উঠোনে ধানের বোঝা মাড়াইয়ের অপেক্ষায় রয়েছে। একতার সভানেত্রী জানালেন ঐ ধানের মধ্যে তাদের ক্ষেতের এবং ব্যবসার জন্য ক্রয়কৃত দু প্রকার ধানই রয়েছে। দুটি বাড়ীতে আমাকে চা খেতে দেয়া হয়েছিল। অন্য দুটি পরিবারেরও টিনের ঘর কিন্তু বহুদিন পূর্বের এবং চারপাশে কাঠের বেড়া দেয়া। এদের সবার বাড়ীতে একটি করে বড় পুকুর আছে।

নারী সদস্যরা জানায় তারা বৎসরে কাপড়চোপড়ের জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করে। এদের সবার পরিবারে সন্তানসংখ্যা কম। দুটি কিংবা তিনটির বেশী সন্তান কারও নেই। সদস্যারা জানান তারা ন্যূনতম মানের কাপড়চোপড়ই পরিধান করেন অযথা অর্থের অপচয় ঘটাতে তারা পছন্দ করেন না। এদের বৎসরে দু'খানা কাপড়ের জন্য ১২০ থেকে ১৪০ টাকা করে ব্যয় করা হয়। ব্লাউজ, পেটিকোট সবাই-ই পরিধান করেন। এ খাতেও কিছু টাকা ব্যয় করতে হয়। পুরুষ সদস্যরা একটি ভাল জামা তুলে রাখেন বাইরে যাতায়তের জন্য। বাড়ীতে সাধারণত: গেঞ্জি পড়েন অথবা নাও পরেন। সন্তানদের এরা বৎসরে একবার ভাল কাপড় কিনে দেয়ার চেষ্টা করেন। সেটা সাধারণত: ঈদের সময়ই হয়ে থাকে। এই পরিবারগুলোর মধ্যে দুটি পরিবার শিক্ষাখাতে কিছু টাকা ব্যয় করতে আগ্রহী। তবে তারা পুত্র সন্তানকে মেট্রিক কিংবা আই.এ পাশ করাতে চাইলেও কন্যা সন্তানদের বেলায় ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাদের মতে বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেলে তারা মেয়েদের পড়াবেন না। স্বামী যদি পড়াতে চায় পড়বে। এখানেও সেই একই সমস্যা। যৌতুকের ভয়ে তারা মেয়েদের যত দ্রুত সম্ভব পাত্রস্থ করতে চান। নারী সদস্যরা জানান তাদের অভিভাবকরাও যৌতুক দিয়েই বিয়ে দিয়েছিল সুতরাং যৌতুক দেয়ার যন্ত্রণা সম্পর্কে তারা অবিহিত।

চিকিৎসা খাতকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবেন না। অসুখ হলেই ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হতে হবে এমন ধারণা এদের নেই। জটিল রোগ কিংবা এ্যাকসিডেন্ট হলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন। সাধারণ জ্বর, পাতলা পায়খানা এসব রোগকে তারা কিছুই মনে করেন না। মাঝে মাঝে হোমিওপ্যাথি করান। এ পরিবারগুলোর মধ্যে তিনটে পরিবার মনে করে অসুখ বিসুখ আল্লাহ দেন সুতরাং এ নিয়ে উদগ্রীব হবার কিছু নেই। গ্রামে গঞ্জে ডাক্তার নেই তাদের যেতেও হয় না।

উপরে বর্ণিত পাঁচটি পরিবারের একজন নারী সদস্যার সাথে আশার ঋণ, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেছি। সে সাহসী, সচেতন কিন্তু গ্রামীণ সমাজে তাকে আপোষ করেই চলতে হচ্ছে নিম্নে তার সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য কেসস্টাডির মাধ্যমে তুলে ধরা হ'ল :-

কেসস্টাডি ৫

আশা/সচেতন নারী এবং তার ক্ষোভ ঃ

রওশন আরা। একতা ভূমিহীন সমিতির সদস্যা। বয়স তিরিশ। তার স্বামীর নাম আলী আকবর সিকদার। বয়স আটত্রিশ। তাদের তিন ছেলে। বয়স পর্যায়ক্রমে চৌদ্দ, বার ও আট। রওশন আরা নিজে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। তার স্বামীও অষ্টম শ্রেণী পাস। রওশন আরার পড়ালেখার ইচ্ছা থাকলেও অভিভাবকদের ইচ্ছায় বিয়ে হয়ে গেছে। তার বিয়ে হয় চৌদ্দ বছর বয়সে। রওশন আরার পিতা নিম্নবিত্ত হলেও তাদের বোনদের সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরেই বিয়ে হয়েছিল। রওশন আরা যখন শ্বশুড়বাড়ীতে আসে তখন শ্বশুড়ের পাঁচ বিঘা জমি, গোয়ালে গরু, বড় আমবাগান ছিল কিন্তু আজ তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। তিন ভাইয়ের মধ্যে জমি বন্টন করতে গিয়ে পরিবারে জমির পরিমান হ্রাস পেয়েছে। তদুপরি দু ননদের বিয়ের সময় কিছু জমি বিক্রী করে ফেলতে হয়েছে। ধানী জমিই তাদের পরিবারের সম্বল ছিল। তার স্বামী অন্য কোন কাজকর্ম করত না। বর্তমানেও করে না। জমি হারাবার পরই রওশন আরাদের সংসারে দারিদ্র নেমে আসে। গত আট বৎসর যাবৎ তাদের সংসারের চাকা মন্থর গতিতে ঘুরেছে। পরিবারের খাবার জোটাবার সামর্থ ছিল না। তার সন্তানদেরও ভাল খাবার, কাপড় দিতে পারে নি। সে ডিবুয়াপুর প্রাইমারী স্কুলে আয়ার কাজ পেলেও তার শ্বশুর তাকে করতে দেয়নি। বাড়ীর সম্মানের সংগে পর্দার বিষয়টিও জড়িত ছিল। যদিও বর্তমানে তারা ঘরের বাইরে যাচ্ছে- পূর্বের মত অতটা কড়াকড়ি পরিবার থেকে পোহাতে হচ্ছে না। তবে সে নিজেও পর্দা মেনে চলতে পছন্দ করে।

রওশন আরার ইচ্ছা ছিল বাড়ীতে বসে পড়ালেখা করে মেট্রিক পাশ করে চাকরী করার কিন্তু স্বামী রাজী নন। তার মতে পর্দা রক্ষা করেও চাকুরী করা যায়। সে আশার সমিতিতে যাচ্ছে সেখানে পুরুষের সাথে কথা বলতে হচ্ছে কিন্তু সমিতির বাড়ী তার বাড়ীর খুব কাছে বলেই সে যেতে পারছে। প্রায়শই কিস্তির টাকা তার স্বামীও পরিশোধ করে। রওশন আরা আশার সংগে সংশ্লিষ্টতা এবং ঋণ বিষয়ে কোন কথা বলতে চায়নি। প্রথম আমাকে এড়াতে চেয়েছে। প্রতিটি কথা ব্যঙ্গ করে বলেছে। প্রকৃতপক্ষেই সে যে ভূমিহীন পরিবারের সদস্য এবং ঋণ নিচ্ছে এটা জানানোর ইচ্ছা তার ছিল না। এছাড়াও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে বলেছে সে নিজেকে অন্যদের তুলনায় স্বতন্ত্র ভাবে এবং অন্যরা তার সমকক্ষ নয় এমন ধারণাও পোষণ করে। দু'তিন দিন নিয়মিত কথা বলার পর সে আশা এবং ঋণ এ দুটো বিষয় নিয়ে কথা বলেছে।

রওশন আরা জানায় সে অঞ্জনা দিদির (অঞ্জনা আশা'র মাঠকর্মী) মাধ্যমে আশার ঋণদানের খবর পায়। অঞ্জনা দিদি তাকে জানিয়েছে তার স্বামীর সাথে আলাপ করে ভূমিহীন সমিতির সাপ্তাহিক মিটিং-এ জানালেই চলবে। সে অনুসারে সমিতির সাপ্তাহিক মিটিং-এ তিনমাস উপস্থিত থাকে। তার স্বামী এ ব্যাপারে স্বেচ্ছায় মতামত দিয়েছে। সে এ যাবৎ তিনবার ঋণ নিয়ে স্বামীকে দিয়েছে। তার ইচ্ছা স্বামী ছোটখাট ব্যবসা করবে কিন্তু আলী আকবর সিকদার জমি চাষ করতে আগ্রহী। প্রথম বছর ঋণ নিয়ে মনস্থির করতে পারেনি কি করবে পরবর্তীতে ভোগেই ব্যয় হয়েছে। রওশন আরা মনে করে একটি পরিবারে দারিদ্রের কারণে বহু চাহিদা অপূরণীয় থাকে সুতরাং অর্থ পেলে সেগুলো পূরণ করতে হয়। কিন্তু ঋণের টাকা ভোগে ব্যয় করে কিস্তি দেওয়া কঠিন। তাদের ক্ষেত্রে সেটিই হয়েছে। তার ৫টা মুরগী আছে। প্রতি সপ্তাহ সে মুরগীর ডিম বাজারে পাঠায়। এভাবে কিস্তি শোধ করে। সে চারবার ঋণ নিয়েছে। তার স্বামী দশ কাঠা ধানী জমি কিনেছে। বর্তমানে তাদের সংসারে তিনবেলা খাবার আসছে। সে তার ছেলেদের স্কুলে পাঠাতে চায় তাই খাদ্যের খরচের পর

শিক্ষা খাতে কিছু টাকা খরচ করতে আগ্রহী। কিন্তু স্বামীর সাথে এ নিয়ে প্রায়ই তার মতান্তর হয়। তার স্বামীর মতামত হ'ল তারা গৃহস্থ পরিবার ছেলেরাও তাই করবে। সে চায় ছেলেরা তার সাথে ক্ষেতে যাবে, ধান মাড়াই বাছাই কাজে সাহায্য করবে। তার স্বামী যুগের পরিবর্তন মানতে রাজী নয়। সে আরও জমি কিনে পুরোপুরি গৃহস্থালী করতে আগ্রহী। রওশন আরার ইচ্ছা ছিল ঋণের টাকা দিয়ে বাড়ীতে হাঁসমুরগী পালন করবে এবং পুকুরে মাছ ছাড়বে। সে মনে করে জমি বর্তমানে না ক্রয় করলেও চলবে আগে হাতে পুঁজি তৈরী করে সম্পত্তি করা উচিত। কিন্তু ঋণের টাকা বর্তমানে স্বামীর নিয়ন্ত্রণে- তার স্বামী যা করছে সে তাই মেনে নিচ্ছে।

আশা সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে সে জানায় আশা ঋণ দিচ্ছে কিন্তু পরিমানে স্বল্প এবং এর মেয়াদও কম। এতে করে সবার পক্ষে আয়বৃদ্ধির পথ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। গরীব পরিবারগুলোতে প্রতিদিন জীবনযাত্রার প্রতিটি জিনিষেরই অভাব সুতরাং টাকা পেলে সাময়িক অভাব পূরণের জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে উঠে। গরীবদের দীর্ঘমেয়াদী ঋনের ব্যবস্থা করা উচিত। রওশন আরার মনে হয় ঋণের টাকা নিয়ে মহিলারা কেউ নিজেরা কিছু করছে না। মহিলারা বাজারে হাটে যেতে পারে না। বাড়ীতে স্বনির্ভর ভাবে কিছু করার ব্যাপারে স্বাধীনতা নেই। আশা যেহেতু ঋণ দেয় তাদের উচিত মহিলারা নিজেরা কিছু করতে পারে এমন পথ তৈরী করে দেয়া। পথটা কি হতে পারে বা হওয়া উচিত এ সম্পর্কে সে গুছিয়ে বলতে পারল না। তার অভিজ্ঞতায় সে দেখেছে টাকা কিংবা সম্পত্তি যার হাতে থাকে সে পরিবার, সমাজ সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সে আরও বলল গ্রামীণ সমাজে শিক্ষিত ব্যক্তির মূল্য আছে কিন্তু টাকা না থাকলে শিক্ষিত ব্যক্তিও মূল্যহীন হয়ে যান।

আশাকে রওশন আরা একটি সংসথা বলে জানে। সে অঞ্জনা দিদির সাথে আলাপক্রমে শুনেছে আশা বিদেশ থেকে টাকা পায়। কেন আশা বিদেশ থেকে টাকা পায় এর উত্তর তার জানা নেই। আশাই বা কেন তাদের ঋণ দিয়ে সাহায্য করছে এ সম্পর্কেও সে কিছু জানে না। জানার চেষ্টাও করেনি। সে বলল হয়ত আশা সরকারের অফিস তাই দিচ্ছে।

ঋণের মাধ্যমে সে কতটা স্বচ্ছলতা অর্জন করতে পারছে এবং ভবিষ্যতে পারবে কিনা জানতে চাইলে সে সহসাই জবাব দেয়নি। কিছুক্ষণ ভেবে জানাল "ভবিষ্যতে কি হবে জানিনা তবে বর্তমানে তিনবেলা খাচ্ছি, সন্তানরা অনাহারে থাকছে না এটাই বলতে পারছি "আশা ঋণ বন্ধ করলে সে বিপদগ্রস্ত হবে কিনা জানতে চাইলে বলল, আশা বেশীদিন ঋণ দিলে আমরা অবশ্যই বেশী উপকৃত হতাম কিন্তু না দিলে কি আর হবে? আশা যখন ছিল না তখন কি আমরা বেঁচে ছিলাম না?"

রওশন আরা জানায় একতা ভূমিহীন সমিতিতে সে এসেছিল শুধু ঋণ নিতে কিন্তু শিক্ষাকার্যক্রমে অংশ নিতে পেরে তার ভাল লেগেছে। তবে সমিতির মিটিং-এ পড়ালেখার বিষয়টি তেমন গুরুত্ব বহন করে না। সে পড়তে পারে বলে বর্ণ ও চেতনা, জীবন গড়ার নতুন পাঠ থেকে কিছু কিছু পড়েছে। সাপ্তাহিক মিটিং-এর কিস্তি শোধ, ঋণ প্রদান এসব বিষয় নিয়ে সময় চলে যায়। পাঠ্যক্রম নিয়ে আলোচনার ইচ্ছা থাকলেও হয়ে ওঠে না। ঋণ বিষয়ক আলোচনা নিয়েই সবাই ব্যস্ত থাকে। দলগঠন নিয়ে সে কিছু ভাবে না। তার মতে যতদিন সমিতি থাকবে দলবদ্ধতাও ততদিন থাকবে। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজস্ব প্রয়োজনে ঋণ নিতে আসে দলগতভাবে কিছু করার চিন্তা কখনো হয়েছে বলে মনে হয় না।

আমি চলে আসার পূর্বে সে আমাকে বর্ণ ও চেতনা বই খুলে বলল এই যে লেখা আছে "মুসলিম মহিলারা ভরণপোষণ পায় স্বামী ভরণ পোষন না দিলে উপজেলা পারিবারিক আদালতে অভিযোগ করুন" "ক্ষমতা আছে তার টাকা আছে যার। পরিবারের কর্তা পুরুষ। তিনি রোজগার করেন তাই এত ক্ষমতা। আমরা টাকা আয় করব। ক্ষমতাবান হব।" রওশন আরা অভিযোগের সুরে বলেন এগুলো বইয়ের কথা- বাস্তবে এমন হতে দেখেনি। পাশাপাশি সে এটাও মনে করে স্ত্রী যদি স্বামীকে ঋণের টাকা এনে না দেয় তাহলে স্বামীর পক্ষে কিছুই করার নেই। তাই যতদিন ঋণের প্রবাহ আছে ততদিন সে অন্তত বলতে পারছে তার জন্যই সংসারে

টাকা এসেছে। তিনবেলা খাবার আসছে। জমি কেনার চিন্তাভবনা চলছে। সে নিজে সন্তানদের পড়ালেখার কথা ভাবতে পারছে। তবে রওশন আরা মনে করে স্বামীর সংসার করেই তাকে চলতে হবে সুতরাং কোন বিরোধে যেতে সে রাজী নয়। সংসারে মহিলাদের আপোষ করে না চললে সংসার টিকিয়ে রাখা দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়।

সবেশেষে সে আমাকে বলল, "আপা কি করবেন আমার কথা লিখে? আমাদের সমস্যার সমাধান কখনোই হয় না।"

চতুর্থ অধ্যায়

ঋণদান পরিস্থিতি, কর্মসংস্থান, আয়বৃদ্ধিমূলক তৎপরতা ও ভূমিহীন মহিলা

ঋণদান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি প্রথমে ভূমিহীন পরিবারগুলোর কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপ করেছি। গবেষণায় দেখা গেছে উপরোক্ত পরিবারগুলো ঋণ প্রাপ্তির প্রথম পর্যায় নির্দিষ্ট কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টির মাধ্যমে আয়বৃদ্ধির পরিবর্তে চলতি ভোগের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। মূলত: দীর্ঘদিন ধরে অভাব এবং দারিদ্রের সাথে লড়াই করে হাতে কিছু পুঁজি আসার পর তারা সেটা পারিবারিক বিভিন্ন চাহিদা পূরণে ব্যয় করে ফেলেছেন। এছাড়াও কি করা যায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করতে গিয়ে টাকা খরচ হয়ে গেছে। এর কারন হিসেবে দেখা গেছে পূর্বোক্ত ঋণ শোধ, ঘর তোলা ও মেরামত, কাপড়চোপড় ক্রয়, যৌতুকের চাপ, ব্যবসা কিংবা টাকা খাটানোর ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞতা ইত্যাদি। ফলে দেখা গেছে পরবর্তীতে যারা ক্ষুদে ব্যবসাকে কর্মসংস্থানে উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছে তাদের বিনিয়োগ এবং আয় স্বল্প কিন্তু ব্যয় বেশী। এই ধরণের পরিবারের মধ্যে ৫৫% জানিয়েছে তাদের জীবনযাত্রার নানা ধরণের ব্যয়ের কারণে ঋণের টাকাকে তারা পুরোপুরি মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করতে সক্ষম হচ্ছে না। ফলে বর্তমান পেশাকে তারা ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের একমাত্র উপায় হিসেবে ধরে রাখতে পারবেন কিনা তা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছেন না। আশা আগামী সনে (১৯৯৫ সন) পর ঋণ কার্যক্রম বন্ধ করে দেবে, এ সময়ের মধ্যে পুঁজি বৃদ্ধি করতে না পারলে তাদের পক্ষে দারিদ্র থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। বর্তমানে তারা যেভাবে একবেলা কিংবা দুবেলা খাচ্ছে এভাবেই চলে যাবে। ভবিষ্যতে কি হবে সেটা বলা তাদের জন্য কঠিন কারণ ফসলের ফলন কেমন হবে, জিনিষপত্রের মূল্য কোন পর্যায় থাকবে এর উপর নির্ভর করছে ভবিষ্যত জীবনাধারা। বেশীদিন ঋন দিলে তাদের মত নিঃস্ব পরিবার হয়তবা স্থায়ী একটি আয়ের পথ তৈরী করতে পারত।

দ্বিতীয় পর্যায় ৪৫% পরিবারের মধ্যে যারা রিক্সা কিনে চালাচ্ছে কিংবা গরু কিনে দুধ বিক্রী করছে তাদের ২২$\frac{1}{2}$% জানিয়েছে (৫ জন রিক্সা কিনেছে ৪ জন গরু কিনেছে) তারা আপাতত: এ পেশাকেই ধরে রাখতে চায়। রিক্সা কিনেছেন এমন একজন বলেছেন তার ইচ্ছা দু'এক বছর পরে তিনি আর একটি রিক্সা কিনতে পারলে অন্যকে দিবেন ভাড়া খাটাবার জন্য। রিক্সা থেকে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে কিস্তি পরিশোধ, পারিবারিক খরচ মিটিয়ে সঞ্চয় করার চেষ্টা করবেন যাতে পরবর্তীতে চাষাবাদের জন্য জমি ক্রয় করতে পারেন। চাষযোগ্য জমিকে তিনি পারিবারিক নিরাপত্তার মাধ্যম হিসেবে মনে করেন। অবশ্য ভূমিহীন পরিবারের প্রায় সব নারী সদস্যই চাষের জমিকে তাদের নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে মনে করেন। উক্ত ২২$\frac{1}{2}$% (৯জন) সদস্যা বলেছে ঋণের মাধ্যমে এ ধরণের পেশা বেছে নিয়ে তাদের আয় বর্তমানে ভালই হচ্ছে। ভবিষ্যতের বিষয় তারা আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিয়েছেন। দুধ বিক্রী করছেন এমন পরিবারের নারীরা বলেছেন এ অঞ্চলে প্রতিবছর খুড়ারোগে গরু মারা যায়। তবুও গাভী সংরক্ষণ করতে পারলে দুধ পাওয়া যায়, গরুর সংখ্যা বাড়ে। এ আশায়ই তারা ঋণের টাকা দিয়ে গরু কিনে দুধ বিক্রীকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন। তারা আশা করেন ভবিষ্যতে তারা এ পেশার মাধ্যমেই হয়ত বা শক্ত ভিত্তি গড়তে পারবেন।

এ শ্রেণীর বাকী ২২$\frac{1}{2}$% পরিবারের চলতি ব্যয়ের পর নতুন কিছু করার সম্ভাবনা খুঁজে পাচ্ছে না। তারা দীর্ঘমেয়াদী ঋণের প্রত্যাশী। কারণ বর্তমানে আরও বিভিন্ন সংস্থা ঋণ দিচ্ছে ঋণ নিয়ে রিক্সা কিনে চালানোর প্রতিযোগিতাও বেড়ে গেছে। পটুয়াখালী ছোট শহর এখানে চাহিদার তুলনায় রিক্সা বেড়ে গেছে। দেখা যায় একজন যাত্রীর জন্য ৯/১০টি রিক্সা একই জায়গায় দাড়িয়ে থাকে। সিনেমা হল, স্কুল, কলেজ, ডি.সি কোর্ট, বাসষ্ট্যান্ড, লঞ্চঘাট এ সমস্ত এলাকায় প্রচুর রিক্সা কিন্তু সবাই সমানভাবে যাত্রী পায় না। শারীরিক শ্রমও

সবার পক্ষে সমান দেয়া সম্ভব হয় না। এ পরিবারগুলির মধ্যে দুধ বিক্রী করছে যারা তাদের এক থেকে দুই কেজি দুধ আসে। কেজি প্রতি বার টাকা হিসেবে বিক্রী করে কিস্তি পরিশোধ, পরিবারের খরচ, গাভী সংরক্ষণ সবকিছু মিলিয়ে তাদের হাতে বাড়তি আয় অবশিষ্ট থাকে না।

আশা প্রদত্ত ঋণের মাধ্যমে নিয়োজিত ৪০টি ভূমিহীন পরিবারের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মাকান্ড থেকে দেখা যায় ৭৭½% পরিবার তাদের বর্তমান পেশার মাধ্যমে আয়বৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছেন না, তারা দীর্ঘমেয়াদী ঋণের প্রত্যাশী। ২২½% পরিবার আয়বৃদ্ধির বিষয় আশাবাদ ব্যক্ত করেছে। তারা মনে করে আশার ঋণ পরিশোধ করা শেষ হলে এবং আশার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও তারা তেমনভাবে বিপদগ্রস্ত হবে না। তবে গ্রামে অন্য কোন সংস্থা ঋণ দিলে তারা গ্রহণ করবে। যেমন গ্রামীন ব্যাংক বর্তমানে গৃহনির্মান ঋণ দিচ্ছে এটা নিতে পারলে বাসস্থানের সমস্যা ঘুচে যাবে। সম্প্রতি ব্রাক ঐ এলাকাতে ঋণ প্রদানের জন্য জরীপ সম্পন্ন করেছে। ব্রাকের ঋণ কর্মসূচীর ব্যাপারেও তারা অবগত। ভূমিহীন পরিবারের সদস্যরা ক্রমাগত ঋণের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এদের কাছে ঋণ কে দিচ্ছে সেটা বড় নয় –বড় হ'ল কি পরিমাণ ঋণ তারা পাবে। ভূমিহীন পরিবারগুলো বর্তমানে বড় আকারের ঋণ নিয়ে জমির মত স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ে আগ্রহী।

ঋণদান পরিস্থিতি

আশা স্বল্পমেয়াদে স্বল্পঋণ ভূমিহীন নারীদের মধ্যে বন্টন করতে সক্ষম হয়েছে। আশার বক্তব্যানুসারে ঋণ প্রদান ও পরিশোধ দুটো পরিস্থিতিই ভাল। মহিলাদের কিস্তি পরিশোধ নিয়ে (ডিবুয়াপুর গ্রামে) বড় ধরণের কোন ঝামেলা পোহাতে হয়নি। মহিলারা কিস্তি পরিশোধে অক্ষম হলেও গ্রুপ মিটিং এ এসে জানিয়েছে। সঞ্চয় থেকে হলেও তারা ঋণ শোধ করার অঙ্গীকার করেছে। কিভাবে ঋণ পরিশোধের টাকা সংগৃহীত হবে এরচেয়ে বড় হ'ল ঋণ পরিশোধ করতে হবে যেভাবেই হোক।

আমি পূর্ববর্তী লেখাতে উল্লেখ করেছি ঋণকে সবাই পুঁজি হিসেবে খাটাতে না পারার কারণে আর্থিক সমস্যা থেকেই যাচ্ছে এবং এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তারা অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস (আত্মীয়স্বজন/পাড়া প্রতিবেশী) থেকে ঋণ করছে। ঋণের টাকা ব্যয় করে কিস্তি পরিশোধ করার জন্যও এদেরকে প্রায়শই ঋণ করতে হয়। কিস্তি পরিশোধের জন্য অনেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রী করতে বাধ্য হন। ২৪টি (চব্বিশটি) পরিবার জানায় তাদের পরিবারে উপার্জনক্ষম লোক কম কিন্তু খাবারের লোক বেশী এটিও একটি বড় সমস্যা। '৯৪ সালে আমি যখন ফিল্ডে কাজ করছি এ পরিবারের নারীরা বলেছে তারা শুনেছে এবার কৃষকরা আমন চাষ দিতে অনীহা প্রকাশ করছে কারণ সার, কীটনাশকসহ অন্যান্য উৎপাদন সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে তারা শঙ্কিত কারণ ফলন ভাল না হলে চালের দাম বৃদ্ধি পাবে এবং কেবলমাত্র খাদ্যের জন্য তাদের ঋণ করতে হয়। আশাকে তারা এ ধরণের অনেক সমস্যাই অবহিত করে না, কারণ ঋণ ভোগে ব্যয় করা কিংবা অন্য উৎস থেকে ঋণ করা দুটোই হয়ত তাদের আশার ঋণ থেকে বঞ্চিত করবে। ঋন নিয়ে সদস্যাদের মধ্যে যে ক্ষোভ আছে তা তাদের বক্তব্যে স্পষ্ট। আশার সুপারভাইজারের সামনে সমিতির একজন সদস্যা বলেছিলেন, "স্যার আপনারা আমাদের চাহিদানুযায়ী ঋণ দেন না। এবার যদি চারহাজারের পরিবর্তে ছয় হাজার টাকা দিতেন তবে ব্যবসায় খাটিয়েও ঘর মেরামত করতে পারতাম।" সুপারভাইজার উত্তর দিয়েছিলেন "পরে বিবেচনা করা হবে।" পরবর্তীতে আমি তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম এ ধরণের আবেদন গ্রহণযোগ্য হয় কিনা। তিনি জানালেন এরকম কোন আবেদন উপরন্তু কর্মকর্তাকে না জানিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় না। তাছাড়া এভাবে একজনের আবেদন রাখলে অনেকেরটা রাখতে হয়। তারা সাধারণত: নিয়মের বাইরে ঋণ দেন না।

আমি সদস্যাদের নিকট সঞ্চয় তহবিল সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্ত কি হবে জানতে চেয়েছিলাম। তারা সবাই–ই বলেছে স্বামীর কাছে জিজ্ঞেস না করে উত্তর দিতে পারবে না। পরবর্তী পর্যায় ১০% বলেছে আরও কিছু টাকা

ঋণ করে ভিটাবাড়ী ক্রয় করবে। ৫০% মেয়ের বিয়ের যৌতুক হিসেবে ব্যবহার করবে ২০% জানিয়েছে তারা "সিদ্ধান্ত নেয়নি কি করবে। এবং বাকী ২০% জানতে চেয়েছিল অন্য লোকের কাছে খাটালে কেমন হয়। এর উত্তর আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব হয়নি। এই ২০% (৮টি পরিবার) পরিবার পূর্বেও ঋণের টাকা সুদে খাটিয়েছে। এই তথ্য বের করতে আমার দীর্ঘদিন লেগেছে। কারণ এ কথা প্রথমেই কেউ-ই স্বীকার করতে চায়নি। ঋণের প্রক্রিয়া থেকে তাদের মনে হয়েছে ব্যবসা বাণিজ্য করতে গেলে ঝুঁকি আছে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে কিন্তু টাকা খাটালে ঘরে বসে সুদও পাওয়া যায় আসল টাকাও ফেরৎ আসে। অবশ্য গ্রামে অনেক সময় টাকা আদায় করতে সমস্যা হয়। তবুও এটাও সত্য টাকা প্রাপ্তির আশা থাকে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে ব্যাপারে তারা দুজন মিলে সিদ্ধান্ত নেন। তবে চূড়ান্ত মতটিই স্বামীরাই বজায় থাকে। ঋণ পেতে স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন হয় বলে টাকাকে স্বাধীনভাবে ব্যয় কিংবা খাটাবার সাহস স্ত্রীরা বর্তমানেও অর্জন করতে পারেন নি। ঋণ না আনতে চাইলে পরিবারের পুরুষের ভৎর্সনা এবং চাপ দুটোই সহ্য করতে হয়। মহিলা সদস্যারা বলেছেন অনেক সময় ঋনের টাকা স্বামীরা খরচ করে ফেলে জানতেও দেননি কি করেছেন। এ ধরণের ঘটনা উল্লেখ করেছেন প্রায় পনের জন।

ঋণের ফলে উদ্ভূত গ্রামীণ পরিস্থিতি ঃ

আশার ঋণ নিয়ে গরীব পরিবারগুলো বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে এ কথাটি যেমন সত্য আবার ঋণ নিয়ে গ্রামীণ সমাজে অনেক প্রশ্নেরও জন্ম হয়েছে। বিশেষত: আশা পুরুষদের সংগঠিত করে ঋণ দিচ্ছে না- সংগঠিত করছে নারীদেরকে। এর পূর্বে গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রদান করলেও পুরুষদের সংগঠিত করে দিয়েছে। কেয়ার মাটি কাটা, আগাছা পরিষ্করএবং রাস্তাবাধার কাজে নারী শ্রমিকদের নিয়োগ করলেও সেখানে তাদের অংশগ্রহণ স্বল্প ছিল। তাই আশা যখন নারীদের সংগঠায়িত করে ঋণ প্রদানের উদ্যোগ নেয় তখন মূলত: তারা গ্রামের চেয়্যারম্যান, মাতবর এ শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে কর্মসূচী আরম্ভ করে। আশা জানিয়েছে তারা পূর্বের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সঙ্গে সংঘাতে গিয়ে গ্রামের মধ্যে কাজ করা সম্ভব হয় না। তারা দীর্ঘদিন এক জায়গায় প্রজেক্ট পরিচালনা করে, সুতরাং তাদের সমঝোতা করে চলতে হয়। সমিতির সদস্যারা জানায় ঋণ নেয়ার পর তাদেরকে গ্রামের মধ্যে বড় ধরণের কোন সংঘাতে না যেতে হলেও পূর্বে বিভিন্ন শ্রেণীর নিকট থেকে তারা বিভিন্ন সহায়তা পেয়েছে তাদের বাড়ীতে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দিয়ে আসত কিন্তু বর্তমানে ভূমিহীন পরিবারের নারীরা এসব কাজ করে না। তাই ঐ শ্রেণীর লোকেরা বিভিন্নভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করে। প্রায়ই বলে "আশা চিরকাল তোমাদের ঋণ দেবে না। আমাদের সংগে তোমাদের সারাজীবন কাটাতে হবে। তখন বিপদে আপদে তোমরা কি করবে?" আমি যখন গ্রামে জরীপ করেছি তখন শুনেছি বিভিন্ন অভিযোগ। যেমন সরকার গরীবদের ঋণ দিয়ে সাহায্য করে ওদের ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন কোন কাজে ডাকলেও পাওয়া যায় না। মাতবর, চেয়্যারম্যান, মেম্বার এ শ্রেণীর লোকেরা ভিন্নভাবে কৌশলে এদের উপর চাপ প্রয়োগ করেছে। যেমন যাদের কাছে পূর্বোক্ত টাকা পাওনা রয়েছে কিংবা ভিটাবাড়ী বন্ধক দিয়েও বর্তমানেও বসবাস করছে তাদেরকে চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে টাকা ফেরৎ দেবার জন্য এবং বাড়ী থেকে উচ্ছেদের হুমকিও দেয়া হচ্ছে। সর্বোপরি নারী সদস্যাদের স্বামীদের বলা হচ্ছে যেহেতু তাদের স্ত্রীরা আশা থেকে ঋণ পায় তাদের হাতে টাকা আসছে কিংবা তাদের স্ত্রীরা যেন গ্রামে অন্য কোন কাজের সঙ্গে জড়িত না হয়। আমি আয়তুন্নেছার কেসস্টাডি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিষয়টি উল্লেখ করেছি। তবে আয়তুন্নেছার মত সাহবানু, আমেনা এরাও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। তারা যেহেতু আশার ঋণ নিচ্ছে সুতরাং তাদেরকে কেয়ার এর রাস্তাবাধার কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। অবশ্য এর পিছনে একই বিষয় অর্থাৎ অর্থ প্রদানের প্রসঙ্গটিও জড়িত ছিল।

আমি গ্রামে বিভিন্ন বাড়ীতে মহিলাদের বক্র মন্তব্যও শুনেছি। আপনি আশার সমিতি থেকে আসছেন? আশা গ্রামের মহিলাদের বাড়ী থেকে পথে নামিয়ে ছাড়ল ইত্যাদি।

তবে গ্রামে ঘুরতে গিয়ে আমার ভিন্নধর্মী অনুভূতিও হয়েছে। অনেক বাড়ীতে আশার খবর জানে না। শুনলেও তেমন কোন মন্তব্য কেই করেনি গ্রামের মৌলভী কিংবা মসজিদের ইমামরাও সরাসরি সংঘর্ষে না এলেও তারা ভূমিহীন পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সতর্ক করে বলেছে ঋণ নিয়ে সংসার চালাচ্ছে ভাল কথা বৌঝিদের

যেন রাস্তায় নামিয়ে কোনকাজ করানো না হয়। তারা পর্দা রেখে চললে গ্রামের সুনাম ক্ষুন্ন হবে না। চেয়্যারম্যান, মাতবর, মেম্বার এ শ্রেণীর লোকের আলাপ আলোচনা থেকে ধারণা করা যায় পূর্বে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর মূল নিয়ন্ত্রক হওয়াতে সরকারী সাহায্য অথবা সম্পদ বন্টনের বিষয়টি তাদের হাতে ছিল। কর্তমানে এনজিও'রা দরিদ্রদের সংগঠিত করে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনার দায়িত্ব নিজেদের হাতে নেয়ার ফলে তারা সরাসরি ভূমিকা রাখতে পারছে না। ভূমিহীন পরিবারগুলো জানায় পূর্বে তারা অর্থ সমস্যা থেকে শুরু করে জমি জমা, বুদ্ধি, পরামর্শ চাইতে এদের শরণাপন্ন হতেন বেশী। বর্তমানে তারা পূর্বের মত মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু একথাও সত্য গ্রামে প্রভাব, প্রতিপত্তি চেয়্যারম্যান, মাতবরদেরই বেশী। তাদেরকে সমীহ করেই তারা চলেন। সোনালী ভূমিহীন সমিতির শাহবানু বলেছিলেন, "চেয়্যারম্যান, মেম্বার, মাতবর, গ্রামের বয়জ্যেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি এরা চিরদিনই আমাগো সমস্যার সমাধান করতে পারে নাই সত্য কিন্তু তারা আছে বইলাই হয়ত আমরা আশার সাহায্য পাইতেছি।" আয়তুন্নেছা, রিজিয়া এরা আবার বলেন, "ভোট আইলেই আমাগো মত গরীবগো খোঁজ খবর হয় না হ'লে তকে নেয় আমাগো খোঁজখবর? ওরা অগো নিয়েই ব্যস্ত।"

নারী সদস্যাদের কাছ থেকে তথ্যে পাওয়া যায় গ্রামে ভূমিহীন শব্দটি কখনো কখনো গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষত গ্রামীণ ঝগড়া ফ্যাসাদে তাদেরকে বলে গালি দেয়া হয়। তাই তারা চান ঋণের মাধ্যমে যেন ভূমিহীন শব্দটি ঘুচাতে পারেন।

বৈদেশিক সাহায্য ও ভূমিহীন মহিলাদের জীবনধারার পরিবর্তন/অপরিবর্তন ঃ

বৈদেশিক সাহায্য ঋণ আকারে ডিবুয়াপুর গ্রামের ভূমিহীন মহিলাদের হাতে পৌঁছাচ্ছে। প্রভাব রাখছে তাদের পারিবারিক, অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। অর্থের অভাবে যেহেতু একসময় সামগ্রিক জীবনধারায় স্থবিরতা এবং দারিদ্র নেমে এসেছিল, অর্থের আগমন তাদের জীবনধারার আদৌ কোন প্রভাব রাখছে কিনা, রাখলেও তার ধরণ কি– নতুন কোন বেশিষ্ট যুক্ত হচ্ছে কিনা , নেতিবাচক কোন প্রভাব তাদের জীবনধারাকে স্পর্শ করেছি কিনা ইত্যাদি। এক কথায় বলা যায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর কোন ধরণের উন্নয়নকে প্রতিনিধিত্ব করছে কিংবা করছে না এটাই।

(ক) ভূমিহীন সমিতির নারী সদস্যাদের গৃহের প্রাত্যহিক কাজকর্মে তারা পূর্বের মতই আছেন। গ্রামের একজন গৃহিনীর গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজের সবটুকুই তাকে করতে হয়। এক্ষেত্রে সাপ্তাহিক মিটিং কিংবা সমিতির কোন কর্মসূচীর সময় তাদের পরিবারের পুরুষরা সন্তান এবং বাড়ীঘরের নিরাপত্তার দায়িত্বটুকু বহন করেন। গৃহস্থালীর কোন কাজে তারা স্বামীর সহায়তা পান না। সমিতির কার্যাবলীর দিনগুলোতে যে স্বামীর সহায়তা পান এটাকেই তারা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে মনে করেন।

(খ) পারিবারিক বলয়ে নারীর অবস্থানগত পরিবর্তনও সামান্য। পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন স্বামী কিংবা পিতা অথবা ভাই বা শ্বশুর। কখনো স্বামীর অবর্তমানে পুত্রসন্তান বড় হলে মা তার উপর নির্ভর করেন। বড় যে কোন ঘটনা যেমন কন্যা বা পুত্রের বিয়ে, সম্পত্তিসংক্রান্ত বিবাদ, জ্ঞাতীগোষ্ঠীর সঙ্গে বিরোধ এসব বিষয় পরিবারের পুরুষরা বর্তমানে গৃহের অভ্যন্তরে স্ত্রীর সংগে আলোচনা করেন, (পূর্বে করতেন না) যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন পুরুষ। কিন্তু সম্পত্তি বিক্রী বা বন্ধক, পাট্টা, পুত্রের বিয়ে বাবদ বড় ধরণের যৌতুক প্রাপ্তি এসব বিষয়ে স্ত্রীর অজ্ঞাতেই করে থাকেন। এসব বিষয় জানতে চাইলে স্বামী রেগে যান।

ডিবুয়াপুর গ্রামের আফসার মাতবরের স্ত্রী রহিমা বেগম (একতার সদস্যা) এ প্রসঙ্গে বলেন, তার স্বামী বলেন "মেয়েদেরকে বাইরের বিষয় জানাতে হয় না। সংসারের কাজ কর ঠিকমত।" একটি বিষয় আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি ঋনের টাকার কার্যকারিতা সম্পর্কে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই আলোচনা করেন এক্ষেত্রে স্ত্রীর অংশগ্রহণের বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। সদস্যারা এও বলেছে তারা নিজেরা যেহেতু বাইরের বিষয় অনেককিছু অবগত নন সুতরাং সিদ্ধান্তের ভার স্বামীর উপরই ছেড়ে দেন। চল্লিশজন সদস্যার মধ্যে বিশজন সদস্যা

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন ঋণের টাকা নিয়ে কলহ বিবাদ এবং মতান্তরও ঘটে। কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন পরিবারে না দিয়ে স্ত্রীর অজান্তে টাকা খরচ করে ফেলা। ঝগড়া এবং কলহই তাদের প্রতিবাদের ভাষা। প্রতিবাদ করার সাহস তারা অর্জন করেছেন কারণ টাকা ঘরে আনছেন তারা।

সদস্যরা জানান সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে তারা অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেন কিন্তু পুরুষের সিদ্ধান্তের অভাবে বাস্তবায়িত হয়না। শিক্ষা ক্ষেত্রে টাকা ব্যয় করার চেয়ে অন্যান্য বিষয়কে তারা বেশী গুরুত্ব দেন।

ভূমিহীন সদস্যদের ক্ষেত্রেও দেখেছি সমাজ শব্দটি নিয়ে তারা শংকিত। সামাজিক নিন্দা এবং কলংকের ভয় এরা ন্যায় অন্যায় বিষয়কেও পৃথক করে যাচাই করেন না। যেমন ভূমিহীন পরিবারের অনেকেই যৌতুক এবং যৌতুক বিষয়ক নির্যাতন নিয়ে বিপদগ্রস্ত। দেখা গেছে পাত্রপক্ষের যৌতুকের চাহিদা ন্যায়সঙ্গত নয় কিন্তু কন্যাপক্ষ এ চাহিদা যেকোন প্রকারে মেটাতে চান। তাদের ধারণা হল মেয়ের কলংক হবে সমাজে দুর্নাম হবে। দ্বিতীয়বার কেউ তাকে বিয়ে করবে না ইত্যাদি। ডিবুয়াপুর গ্রামে সমাজে নারীর অংশগ্রহণ নেই। পুরুষের আধিপত্যই প্রবল। নারী সংক্রান্ত কোন ঘটনা হলেও নারীর বিষয়টিকে জনসমক্ষে উপস্থাপন করেন পুরুষ। ভূমিহীন সমিতির সদস্যারা বলেন তারা অন্যের মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য তারা নিজেদের মধ্যে অথবা গ্রামে বয়জেষ্ঠা এবং জ্ঞানী, বিবেচক ও বিচক্ষণ কোন রমনীকে তাদের নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন। প্রয়োজনবোধে ঐ মহিলা প্রতিনিধি পর্দার আড়ালে বসে বক্তব্য পেশ করেন। মূলত: নারীর সমাজের সম্মুখীন হওয়ার বিষয়টি কেবল পর্দার দ্বারাই বাধাগ্রস্ত নয় সামাজিক কর্মাদি পুরুষই করে আসছে এ চিরাচরিত মূল্যবোধও ক্রিয়াশীল। মহিলারা সাধারণত: কনে দেখা, পাড়াপ্রতিবেশীর বিয়ে, হলুদ এ ধরণের অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ সমস্ত অনুষ্ঠানে মহিলারা আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সংগে সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। মহিলাদের কিছু নিজস্ব আচার অনুষ্ঠানাদি আছে যেখানে পুরুষের উপস্থিত থাকে না। সোনালীর সভানেত্রী আয়তুন্নেছা জানান তিনি তার মেয়ে বিয়ে কিংবা বিবাদ মীমাংসার ব্যপারে বয়জ্যেষ্ঠ জ্ঞাতিসম্পর্কীয় কারও কাছে বুদ্ধি কিংবা পরামর্শ নেন তবে সিদ্ধান্ত নেন নিজেই।

আশার সঙ্গে সংযুক্ততার ফলে নারীদের জীবনযাত্রায় গতিশীলতা কিছুটা নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়েছে এটা স্বীকার করতেই হবে। সদস্যাদের মধ্যে সাইত্রিশ জনই বলেছেন ঋণ নিতে এসে দীর্ঘদিন পর তারা প্রতিনিয়ত বাড়ীর বাইরে আসার সুযোগ পেয়েছেন এবং বিভিন্ন জনের সাথে আলাপ হয়েছে যা এর পূর্ব সম্ভব হয়নি। কিন্তু আশার ৫/৬ জন সদস্যা বাদে সবাই-ই বলেছে মাঠে কিংবা রাস্তায় কাজ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় কারণ পরিবারের পুরুষ তা পছন্দ করেন না। তবে সদস্যারা মাঝে মাঝে অবসরে পরিচিত জনদের বাড়ী যাতায়াত করেন। ডিবুয়াপুর গ্রামে যেকজন মহিলা কেয়ার এর রাস্তাবাধার কাজে যান তাদের পারিবারিক অবস্থা একেবারেই নিম্নতম স্তরের এবং স্বামী নেই। হালিমা বেগম (সোনালীর সদস্যা) (স্বামী কালামোহন আকন) কেয়ার এ কাজ করেন। তিনি জানান তার জমি, বাড়ী কিছুই নেই। স্বামী বেকার। অভাবের তাড়নায় দেড়মাসের শিশু নিয়েই সে কাজে যায়। এক্ষেত্রে স্বামী নীরব কারণ সে স্ত্রীর রোজগারের উপর নির্ভরশীল। আবার সোনালী ভূমিহীন সমিতির ফরিদা বেগম বলেন ভিন্ন কথা, "শাহবানু তাকে কেয়ার এর কাজে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু তার স্বামী বলেছে মাটি কাটা পুরুষের কাজ। ওখানে যাবার প্রয়োজন নেই।" সদস্যারা সবাই-ই বলেছেন গ্রামের রাস্তাঘাটে তাদের চলাফেরার বিষয় গ্রামের লোকেরা বর্তমানে ততটা কৌতুহলী নন কারণ তারা আশার ঋণ প্রদানের বিষয় অবগত।

ভূমিহীন মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন যতটুকু হোক না কেন সামাজিক মূল্যবোধগুলো তাদের জীবনধারা থেকে বিলুপ্ত হয়নি। পর্দা, যৌতুক, নির্যাতন এসব বিষয়ে সম্পর্কে তাদের কিছুটা ধারণা তৈরী হলেও এর বিরুদ্ধে প্রতিকার কিংবা প্রতিবাদের ভাষা অজানা। সমিতির সদস্যারা পর্দা মেনে চলাটাকে সমর্থন করেন। কিন্তু প্রয়োজন এবং দারিদ্র দুটোই পর্দার বিষয়কে গ্রামীণ ভূমিহীন নারীর জীবন থেকে কিছুটা দূরে রেখেছে। পর্দার বিষয়টি ধর্মীয় বোধের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কায়িত। আমি পূর্ববর্তী অধ্যায় গ্রামীণ নারীর

পর্দার বিষয়টি উল্লেখ করেছি। গ্রামীণ সাধারণ নারীর সঙ্গে ভূমিহীন সমিতির মহিলাদের পার্থক্য হ'ল প্রয়োজনে তাদের বাড়ীর বাইরে যেতে হচ্ছে, অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছে সময় অসময় আশার ইউনিট অফিস বা শাখা অফিসে যেতে হচ্ছে। আবার আশার কেন্দ্রীয় অফিসিয়ালরা গেলে তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। মহিলারা জানান এসব ক্ষেত্রে তাদের স্বামীরাও আসেন। যারা মাথায় কাপড় দেন কিংবা বোরখা পড়েন তারা সে অবস্থাতেই কথা বলেন। সমিতির এসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নারী সদস্যরা নিজেদের আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে পূর্বের মত দূরত্ব তৈরী করে কথাবার্তা বলেন না। পর্দা এবং সামাজিক নিয়ম দুটোই রক্ষা করেন যদিও কিছুটা শৈথিল্য আছে। যেমন তারা পর্দার আড়ালে দাড়ালেও দেখা দিয়েই কথা বলেন। (দেখা দেয়া বলতে মুখমন্ডল অনাবৃত করে কথা বলা)

যৌতুক এবং নির্যাতন দুটো বিষয়ই তারা অবগত এবং এ দুটোই যে অন্যায় সেটাও সদস্যাদের অজানা নয়। কিন্তু ডিবুয়াপুর গ্রামে দুটোরই প্রকোপ রয়েছে। আমি পূর্বে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তা উল্লেখ করেছি। শারীরিক নির্যাতনকেই এরা নির্যাতন বলে মনে করেন কিন্তু মানসিক নির্যাতন (গালমন্দ) স্বাভাবিক বলে মনে করেন। নারীদের মধ্যে এ ধারণাটি প্রবল যে পুরুষ বাইরে কাজ করে। সংসারে ব্যয় নির্বাহ করে সুতরাং তার পরিশ্রম বেশী; তাই স্বামী নির্যাতন করলেও মেনে নেয়া উচিত। সদস্যারা এ বিষয়টিতে লজ্জিত এবং দ্বিধাগ্রস্ত। চল্লিশজন মহিলার মধ্যে দশজন আংশিক খোলামেলাভাবে বলেছেন বিবাহিত জীবনে তারা কারণে অকারণে স্বামীর হাতে নির্যাতিত হয়েছে। এছাড়া শাশুড়ী, ননদদের দ্বারাও নির্যাতিত হয়েছে। চল্লিশজন সদস্যাই বলেছেন, "পিতার সংসারের পর স্বামীর সংসার আমাদের একমাত্র ঠিকানা। স্বামী দুটো গালমন্দ কিংবা চড় দিলেই কি করা যাবে? আমরা ঘর ভাঙতে রাজী নই।" একতা ভূমিহীন সমিতির সদস্যা রওশন আরা বলেন, "স্বামীরা যাই করুক আমরা কি করবো? সন্তানদের নিয়ে কোথায় যাব? গ্রামের মেয়ে সংসার করতেই হবে।" পিয়ারা বেগম (সোনালীর সদস্যা) বলেন, "মেয়ে হয়ে জন্মেছি পুরুষের অত্যাচার তো সহ্য করতেই হবে।" প্রসংগক্রমে দেনমোহরের বিষয়টি এলে দেখা যায় সদস্যারা আশার সংগে সংশ্লিষ্টতার পর দেনমোহর সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। তারা জানান যৌতুকের বিষয়টি এত প্রবল যে দেনমোহর নিয়ে তারা বেশী ভাবিত নন। মেয়ের জন্য পাত্র যোগাড় করাই কঠিন সেখানে দেনমোহরের বিষয়টি বড় হয়ে দাড়ালে মেয়ের বিয়েই হবে না। ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারগুলো এ নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়। মেয়েকে কোন উপায় শ্বশুরালয়ে পাঠাতে পারলেই স্বস্তি পায়।

আমি ভূমিহীন সদস্যাদের সবার কাছে জানতে চেয়েছিলাম তারা আশার সংগে সংশ্লিষ্ট হয়ে ঋণ নিচ্ছে, এ সময়কালে গ্রামের বিত্তবান বা ধর্মপ্রান শ্রেণী এর বিরুদ্ধে দাড়ালে কিংবা বাধা প্রদান করে তারা কি করবে? প্রথমে অনেকেই বলেছে শুনবো না, মানবো না। কেউ বলেছে তারা তো আমাদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করে না যে তাদের কথা শুনবো। আমরা না খেয়ে থাকলে তো তারা ঘরে খাবার পৌঁছে দেবে না সুতরাং কেন শুনবো? তাছাড়া আমরা ঘরে বসে ঋণ নেই এতে কে কি বলবে? তদুপরি আমি বললাম ওদের আক্রমন যদি শক্তিশালী হয় তাহলে কি করবেন! দল বেঁধে সবাই মিলে আক্রমন প্রতিহত করবেন? এ ব্যাপারে সবাইকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখা গেছে। অনেকেই বলেছে সেটা বলতে পারবো না। এ ধরণের কাজ তারা কখনো করেনি। কিছু (দশ বারজনের মত হবে) সদস্যা বলেছেন আশা যদি তাদের সাথে থাকে তাহলে তারা হয়ত সংগঠিত হতে পারে কিন্তু স্বউদ্যোগে কিছু করার সাহস তাদের নেই। মহিলারা পারিপার্শ্বিক প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে দাড়াবার মত যথেষ্ঠ সাহস অর্জন করতে পারেন নি। বিত্তবান এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি উভয়কেই তারা যেমন সমীহকরেন, সেই সাথে তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতি ভয়ও আছে।

ডিবুয়াপুর গ্রামের ভূমিহীন পরিবারের মহিলাদের আশা সম্পর্কিত ভাবনা ঃ

'আশা' ডিবুয়াপুর গ্রামে ভূমিহীন মহিলাদের চারবৎসর যাবৎ ঋণ দিচ্ছে। মহিলারা আশার ঋণ কর্মসূচীর সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছেন। সঙ্গত কারণে আমি তাদের কাছে 'আশা' সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানতে

পর্দার বিষয়টি উল্লেখ করেছি। গ্রামীণ সাধারণ নারীর সঙ্গে ভূমিহীন সমিতির মহিলাদের পার্থক্য হ'ল প্রয়োজনে তাদের বাড়ীর বাইরে যেতে হচ্ছে, অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছে সময় অসময় আশার ইউনিট অফিস বা শাখা অফিসে যেতে হচ্ছে। আবার আশার কেন্দ্রীয় অফিসিয়ালরা গেলে তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। মহিলারা জানান এসব ক্ষেত্রে তাদের স্বামীরাও আসেন। যারা মাথায় কাপড় দেন কিংবা বোরখা পড়েন তারা সে অবস্থাতেই কথা বলেন। সমিতির এসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নারী সদস্যরা নিজেদের আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে পূর্বের মত দূরত্ব তৈরী করে কথাবার্তা বলেন না। পর্দা এবং সামাজিক নিয়ম দুটোই রক্ষা করেন যদিও কিছুটা শৈথিল্য আছে। যেমন তারা পর্দার আড়ালে দাড়ালেও দেখা দিয়েই কথা বলেন। (দেখা দেয়া বলতে মুখমন্ডল অনাবৃত করে কথা বলা)

যৌতুক এবং নির্যাতন দুটো বিষয়ই তারা অবগত এবং এ দুটোই যে অন্যায় সেটাও সদস্যাদের অজানা নয়। কিন্তু ডিবুয়াপুর গ্রামে দুটোরই প্রকোপ রয়েছে। আমি পূর্বে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তা উল্লেখ করেছি। শারীরিক নির্যাতনকেই এরা নির্যাতন বলে মনে করেন কিন্তু মানসিক নির্যাতন (গালমন্দ) স্বাভাবিক বলে মনে করেন। নারীদের মধ্যে এ ধারণাটি প্রবল যে পুরুষ বাইরে কাজ করে। সংসারে ব্যয় নির্বাহ করে সুতরাং তার পরিশ্রম বেশী; তাই স্বামী নির্যাতন করলেও মেনে নেয়া উচিত। সদস্যারা এ বিষয়টিতে লজ্জিত এবং দ্বিধাগ্রস্ত। চল্লিশজন মহিলার মধ্যে দশজন আংশিক খোলামেলাভাবে বলেছেন বিবাহিত জীবনে তারা কারণে অকারণে স্বামীর হাতে নির্যাতিত হয়েছে। এছাড়া শ্বাশুড়ী, ননদদের দ্বারাও নির্যাতিত হয়েছে। চল্লিশজন সদস্যাই বলেছেন, "পিতার সংসারের পর স্বামীর সংসার আমাদের একমাত্র ঠিকানা। স্বামী দুটো গালমন্দ কিংবা চড় দিলেই কি করা যাবে? আমরা ঘর ভাঙতে রাজী নই।" একতা ভূমিহীন সমিতির সদস্যা রওশন আরা বলেন, "স্বামীরা যাই করুক আমরা কি করবো? সন্তানদের নিয়ে কোথায় যাব? গ্রামের মেয়ে সংসার করতেই হবে।" পিয়ারা বেগম (সোনালীর সদস্যা) বলেন, "মেয়ে হয়ে জন্মেছি পুরুষের অত্যাচার তো সহ্য করতেই হবে।" প্রসংগক্রমে দেনমোহরের বিষয়টি এলে দেখা যায় সদস্যারা আশার সংগে সংশ্লিষ্টতার পর দেনমোহর সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। তারা জানান যৌতুকের বিষয়টি এত প্রবল যে দেনমোহর নিয়ে তারা বেশী ভাবিত নন। মেয়ের জন্য পাত্র যোগাড় করাই কঠিন সেখানে দেনমোহরের বিষয়টি বড় হয়ে দাড়ালে মেয়ের বিয়েই হবে না। ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারগুলো এ নিয়ে উচ্চকিত নয়। মেয়েকে কোন উপায় শ্বশুরালয়ে পাঠাতে পারলেই স্বস্তি পায়।

আমি ভূমিহীন সদস্যাদের সবার কাছে জানতে চেয়েছিলাম তারা আশার সংগে সংশ্লিষ্ট হয়ে ঋণ নিচ্ছে, এ সময়কালে গ্রামের বিত্তবান বা ধর্মপ্রান শ্রেণী এর বিরুদ্ধে দাড়ালে কিংবা বাধা প্রদান করে তারা কি করবে? প্রথমে অনেকেই বলেছে শুনবো না, মানবো না। কেউ বলেছে তারা তো আমাদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করে না যে তাদের কথা শুনবো। আমরা না খেয়ে থাকলে তো তারা ঘরে খাবার পৌঁছে দেবে না সুতরাং কেন শুনবো? তাছাড়া আমরা ঘরে বসে ঋণ নেই এতে কে কি বলবে? তদুপরি আমি বললাম ওদের আক্রমন যদি শক্তিশালী হয় তাহলে কি করবেন! দল বেঁধে সবাই মিলে আক্রমন প্রতিহত করবেন? এ ব্যাপারে সবাইকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখা গেছে। অনেকেই বলেছে সেটা বলতে পারবো না। এ ধরণের কাজ তারা কখনো করেনি। কিছু (দশ বারজনের মত হবে) সদস্যা বলেছেন আশা যদি তাদের সাথে থাকে তাহলে তারা হয়ত সংগঠিত হতে পারে কিন্তু স্বউদ্যোগে কিছু করার সাহস তাদের নেই। মহিলারা পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাড়াবার মত যথেষ্ঠ সাহস অর্জন করতে পারেন নি। বিত্তবান এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি উভয়কেই তারা যেমন সমীহকরেন, সেই সাথে তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতি ভয়ও আছে।

ডিবুয়াপুর গ্রামের ভূমিহীন পরিবারের মহিলাদের আশা সম্পর্কিত ভাবনা ঃ

'আশা' ডিবুয়াপুর গ্রামে ভূমিহীন মহিলাদের চারবৎসর যাবৎ ঋণ দিচ্ছে। মহিলারা আশার ঋণ কর্মসূচীর সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছেন। সঙ্গত কারণে আমি তাদের কাছে 'আশা' সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানতে

চেয়েছিলাম। আশা কি, কি তাদের উদ্দেশ্য, কেন ঋণ দিচ্ছে, ঋণের উৎস কি, আশাকে নিয়ে তারা কি ভাবছে ইত্যাদি।

চল্লিশজন মহিলার মধ্যে সাইত্রিশজন বলেছে আশা একটি ব্যাংক। গ্রামীণ ব্যাংকের মতই আশা গরীব মানুষকে বাঁচানোর জন্য ঋণ দিচ্ছে। সরকার হয়তো বা আশাকে টাকা দেয়। কেউ বলেছে বসাকবাজার ইউনিট থেকে ঋণের টাকা আসে। বসাকবাজার ইউনিটে আসে পটুয়াখালী শাখা অফিস থেকে। পটুয়াখালী অফিস ঢাকা থেকে টাকা আনে। বাকী তিনজনের মধ্যে একজন বলেছে আশা সরকারী সংস্থা। সরকার আশাকে টাকা দেয়। দুজন জানিয়েছে আশা একটি অফিস। বিদেশীরা আশাকে টাকা দেয় গরীবদের সাহায্য করবার জন্য। কেন দেয় এর বেশী তাদের জানা নেই। আশা কি এ নিয়ে গভীরতর চিন্তা এরা কখনোই করেনি। তারা তাদের ধারণা থেকে উত্তর দিয়েছে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে আশা সম্পর্কে কিছু বলা হলেও সবাই তা মনে রাখতে পারেন নি। সদস্যারা বলেন "আমরা ঋণ পামু সেই আগ্রহের ভিত্তিতে আইছি বেশী কিছু ভাবার বা জানার ইচ্ছা আমাদের নেই।"

আশা তাদের উপকার করছে এরকম আরও অনেক ব্যাংকই বিভিন্ন গ্রামে আছে। এদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত তারা বলতে পারে নি। তবে ভূমিহীন মহিলারা বলেছেন যে তারা টাকা পয়সা ঋণ করতে গিয়ে বহুভাবে প্রতারিত হয়েছেন, পাওনাদারের গালমন্দ শুনেছেন। কিন্তু আশার থেকে টাকা নিয়ে তাদের হয়রানি হতে হয়নি। যদিও কিস্তি পরিশোধ নিয়ে প্রায় সবাই-ই সমস্যাগ্রস্ত হন তবুও এ নিয়ম না মানলে ঋণ পাওয়া যায় না বলে নিরুপায় হয়ে সবাইকে পরিশোধ করতে হয়। সবাই সময়মত পরিশোধ করতে পারেন না। একটি বিষয় সবাই বলেছে আশা কত টাকা ঋণ প্রদান করবে, কিভাবে করবে, কি প্রক্রিয়ায় ফেরৎ নেবে, ফেরৎ না পেলে কি হতে পারে এ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত আশাই নেয়। ঋণ নিয়ে কে কোন শ্রেণীর পেশায় নিয়োজিত এ ব্যাপারে আশা প্রায়শই জানে না।

সদস্যারা জানায় তারা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নানাবিধ সমস্যায় আক্রান্ত কিন্তু 'আশা' তাদের সমস্যার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা পালন করে না বলে তারা জানায় না। সদস্যরা নিজেরা এটাও ভাবেন সব ব্যাপার আশাকে না জানানোই উচিত। ঋণ দেয় বলেই বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখতে হবে এ প্রত্যাশা তারা করেন না। যৌতুক, নির্যাতন ঋণের টাকার অপচয় এ সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়েও সদস্যারা আশার তত্ত্বাবধায়কদের সংগে আলোচনা করেন না। সৃষ্টির মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয় সদস্যারা তেমন বেশী আগ্রহী নন। ঋণের মেয়াদ শেষ হলে সবাই-ই গ্রুপ ছেড়ে দেবেন।

উপসংহার

আশার ঋণ কর্মসূচীর নাম "Socio-Ecomomic Credit Programme"
আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি আশার ঋণের উৎস বৈদেশিক সাহায্য। ডিবয়াপুর গ্রাম ব্যতীত পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন গ্রামে ভূমিহীন মহিলাদের মধ্যে এ ঋণদান প্রক্রিয়া চালু আছে। আমি ডিবুয়াপুর গ্রামে অবস্থানরত ৯৬টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে আশার চল্লিশটি পরিবারের মধ্যে বন্টনকৃত ঋণদান কর্মসূচীর উপর সংগৃহীত তথ্য পূর্ববর্তী অধ্যায় সন্নিবেশিত করেছি। বর্তমান অধ্যায় ভূমিহীন নারীদের মধ্যে বন্টনকৃত বৈদেশিক সাহায্যের ফলাফল সম্পর্কিত মূল্যায়নধর্মী আলোচনা উপস্থাপিত হ'ল।

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সূত্রে দেখা যায় বৈদেশিক সাহায্য উপজাত নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ভূমিহীন নারীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ সাহায্য প্রাপ্তির পূর্ববর্তী অবস্থার তুলনায় কিছুটা ভাল অবস্থানে রয়েছে। মূলত: দীর্ঘদিন দারিদ্রের মধ্যে বসবাসের পর নগদ অর্থ প্রাপ্তি ভূমিহীন পরিবারগুলোর মধ্যে নুতন করে জীবনধারণের আশার সঞ্চয় করে। কৃষিখাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা অকৃষিখাতে ভিন্নতর কর্মসংস্থানের চেষ্টা করছে। ভূমিহীন পরিবারগুলো ন্যূনতম চাহিদা পূরণের নিমিত্তে ঋণকে ব্যবহার করছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়েই গ্রামীণ আর্থ, সামাজিক ও পারিবারিক পরিমন্ডলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভিত সামান্যতম হলেও নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে। তাই পারিবারিক বলয়ে একজন নারী কিংবা স্ত্রীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যদিও সাহায্যের ব্যবহার এবং তার ফলাফল নারী স্বয়ং ভোগ করতে পারছে না কিন্তু অর্থের উপযোগিতা ও অর্থকে উৎপাদনে রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। এর মূল কারণ অর্থ নারীর শ্রমের বিনিময়ে উপার্জিত না হলেও অর্থ আসছে নারীর মাধ্যমে এ বোধ থেকেই বিষয়গুলোর সৃষ্টি হয়েছে। নারীদের সামাজিক জীবনে পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রেক্ষেতে সাধারণভাবে পর্যালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীকে বলা যায় বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহের ফলে গ্রামের ভূমিহীন নারীদের জীবনে একধরণের পরিবর্তন সূচীত হচ্ছে। যদিও একথাটি অনস্বীকার্য যেকোন প্রকল্প কিংবা কর্মসূচীর প্রয়োগে একরকম পরিবর্তন আসবে হতে পারে সেটা ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক। তবে এ সম্পর্কে ঢালাওভাবে আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত নয় এর জন্য প্রয়োজন বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ।

কারণ বিদেশ নির্ভর উন্নয়ন প্রতিকল্প এবং গ্রামীণ নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম, সামগ্রিকভাবে ভূমিহীন পরিবারগুলোকে তাদের ভঙ্গুর ও পতনশীল অবস্থান থেকে মুক্ত করতে পারেনি। ঋণের অর্থ প্রাপ্তির ফলে চল্লিশটি পরিবারের দারিদ্র বিমোচিত হয়েছে একথা বলা সম্ভব নয়। ঋণ (বৈদেশিক সাহায্যজাত) চলাকালীন সময় স্বল্পতম সুবিধা অর্জন করলেও ভবিষ্যত সম্পর্কে একটি বড় অংশই ইতিবাচক মন্তব্য করতে পারেনি। ঋণকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে পুনরুৎপাদন এবং পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে উদ্ধৃত্ত সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন পুঁজি তৈরী করে স্বল্পতম সময় ন্যূনতম উন্নয়ন অর্জন করতে অসমর্থ হচ্ছে। গ্রামের এ পরিবারের সদস্যরা একটি সময় চাষাবাদ করেছে পরবর্তী সময় দিনমজুরী করেছে– ফলে ব্যবসা, পুঁজি, বাজার, সঞ্চয়, বিনিয়োগ এ সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক বিষয়গুলো আত্মস্থ করা এদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আমার গবেষণা এলাকাধীন একটি পরিবারের নারী আছিয়া বেগম জানিয়েছিলেন ঋণ নিয়ে তারা দ্বিতীয় বছর ১৩০ টাকা মন দরে ধান কিনেছিলেন পরবর্তীতে বিক্রীর জন্য। কিন্তু বিক্রী করতে গিয়ে তাকে মনপ্রতি দশ টাকা ক্ষতি স্বীকার করে বিক্রী করতে হয়েছে। এ ক্ষতি পূরণ করবার সামর্থ তাদের নেই ফলে লাভের পরিবর্তে লোকসানের বোঝাই বইতে হয়। ঋণ সাহায্য দ্বারা লাভবান হচ্ছে সেই শ্রেণী যারা তিনবেলা খেতে পারছে। এবং তারাই স্থায়ী কর্মসংস্থান কিংবা পুঁজি প্রবৃদ্ধির কথা ভাবতে পারছে। এরাই আবার ভূমিহীন শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাভোগী শ্রেণী হিসেবে অন্যান্য দরিদ্র শ্রেণীকে শোষণ করার চেষ্টা করছে সুদে টাকা খাটিয়ে কিংবা তাদের মর্যাদাকে চ্যালেঞ্জ করে। গ্রামীণ নারীদের মধ্যে বন্টিত অর্থের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে নিম্নোক্ত অবস্থা ঃ

প্রথমত: ঋণ সাহায্যের উপর দীর্ঘমেয়াদী পরনির্ভরশীলতা অর্থাৎ ভূমিহীন মহিলাদের একটি বড় অংশ অবিরত সাহায্য প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্ত:স্থিত হওয়ার আশা পোষণ করেন;

দ্বিতীয়ত: ঋণের দায়ভার গ্রহণের অক্ষমতা থেকে (কিস্তি ও সুদ শোধ) ঋণ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ(স্বল্পসংখ্যক);
তৃতীয়ত: ঋণকে সহজ উপায়ে ব্যবহারের চেষ্টা (যেমন সুদে খাটানো);
চতুর্থত: বৈদেশিক সাহায্য ভোগী হিসেবে গ্রামীণ সমাজে অপরাপর দরিদ্র শ্রেণীগুলোর চেয়ে নিজেদেরকে একটি প্রিভিলেজ গোষ্ঠী হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।

উপরোক্ত অবস্থাগুলির মধ্যে দীর্ঘমেয়াদে ঋণকে ব্যবহার করার প্রবণতাই বেশী। মূলত: উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিস্তৃত পরনির্ভরতার অধিকতর সর্বব্যাপী রূপ এ গ্রামীণ ভূমিহীন শ্রেণীকেও গ্রাস করেছে। প্রকৃতপক্ষে একেবারে নি:স্ব একটি পরিবারের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। আবার একই সাহায্য ভূমিহীন পরিবারগুলোর মধ্যেই অসম সামাজিক সম্পর্ক তৈরী করছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সমিতিতে অন্তর্ভূক্ত কিন্তু অন্যত্র মজুরী শ্রমিকের কাজ করছে অথবা বর্তমানেও দরিদ্রাবস্থায় রয়েছে তাদেরকে অবহেলা এবং উপেক্ষা করছে। মূলত: দরিদ্র ভূমিহীন শ্রেণীর জন্য এ সাহায্য তাদের একবেলা কিংবা দুবেলা খাবারের সংস্থান করা ব্যতীত অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা অর্জনে আজও পিছিয়ে আছে।

এর পরেও সে প্রশ্নটি প্রশ্ন হিসেবেই থেকে যাচ্ছে বৈদেশিক সাহায্য গ্রামীণ নারীর হাতে পৌঁছার ফলে কি তার অবস্থানগত অধ:স্তন অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। ঘটলেও তার পরিমাণগত ও গুণগত মান খুবই স্বল্প। ঋণ গৃহে আনছে নারী। অনুমতি প্রদান ও ব্যবহার করার ক্ষমতা পুরুষের। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর স্বাধীন সত্ত্বা কিংবা কর্তৃত্বও ক্ষমতার বিষয়টি গড়ে ওঠেনি। অর্থ গৃহে নেয়ার পর তারা প্রাথমিক অবস্থায় অর্থের আলোচনায় প্রাধান্য পেলেও পরবর্তীতে পুরুষ তার অপচয় করলেও নারীর কিছুই করণীয় থাকে না। পুরানো সামাজিক নিয়মগুলোই যদি নারীর উপর বহাল থাকে তাহলে তাদের জীবনধারার পরিবর্তন কতটা আশা করা যায়? পরিবার ও সমাজ উভয় পরিসরেই পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ ক্রিয়াশীল। সমস্ত বিষয়গুলো মিলিয়েই নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি প্রবল প্রশ্নের সম্মুখীন।

প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে। এবং এ কথাটিও সত্য পরিকল্পিত উন্নয়নমুখী জাতির মাধ্যমে এ সাহায্যের সদ্ব্যবহারের ফলে উন্নয়ন আসাই স্বাভাবিক। কিন্তু উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে এনজিও-দের দ্বারা। রাষ্ট্র, সরকার কিংবা রাজনৈতিক দলগুলো গ্রামীণ নারী উন্নয়নের বিষয়কে একটি মূখ্য বিষয় হিসেবে এজেন্ডাভুক্ত করলেও গ্রামীণ নারী উন্নয়নের পরিকল্পিত কর্মসূচী প্রণয়নে যথার্থ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। এটি রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ। অথচ বাংলাদেশে বিরাজমান গ্রামীণ ভূমিহীন নারীর দারিদ্র বৃদ্ধির প্রণালীবদ্ধ মাত্রিকতার উপর অধিকতর মনোযোগ দেয়া অত্যন্ত জরুরী। কারণ নারী উন্নয়নের বিষয়টি বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের আভ্যন্তরীন গতিময়তার উপর অধিকাংশই নির্ভরশীল। বাংলাদেশ সমাজে নারীর সমস্যা অন্তহীন আর গ্রামীণ নারীর সমস্যার বিষয়টি বহুমাত্রিক। তাই কেবল বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহারের মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে কতখানি যৌক্তিক সেটি বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ বিষয় দায়বোধ থেকে মুক্তির চেষ্টা নারীর উয়নকে কেবল বাধাগ্রস্তই করবে। যা আমাদের কাম্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী ঃ

১। নারীমুক্তি আন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রাম ঃ একটি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ঃ অনুবাদ শেখ মাহফুজুর রহমান, পৃষ্ঠা ১৪, সমাজ চেতনা সংখ্যা ২০

২। প্রসঙ্গ ঃ উন্নয়ন ও পারিকল্পনা (উন্নয়ন সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন পৃষ্ঠা(২ –১৮) প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

৩। বাংলাদেশের উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য ও নারী সমাজ ঃ মেঘনা গুহঠাকুরতা, সমাজ নিরীক্ষণ , সংখ্যা ২২ পৃষ্ঠা ৫

৪। বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ঃ সম্পাদনা বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, জারিনা রহমান খান পৃষ্ঠা ৩ প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৮৭ প্রকাশক সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র

৫। মেঘনা গুহঠাকুরতা পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২

৬। ডঃ সেলিম জাহান পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৪০

৭। চৌধুরী (১৯৮২) গ্রামীণ নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্থায় অংশগ্রহণ/ জারিনা রহমান খান, সমাজ নিরীক্ষণ ২২ পৃষ্ঠা ৪৫

৮। papanek 1973,292 queted froom women, work and property in north west India/ Ursula sarma p. -5

৯। Sing, sehjo, cirnes of honaur purdah culture,1986 new dehli p.33 নেয়া হয়েছে ।সুরাইয়া বেগম পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক অংশ গ্রহণে গ্রামীণ নারী পৃষ্ঠা ৭৫

১০। অধঃস্তনতা ও সংগ্রাম বাংলাদেশের নারী ঃ– নায়লা কবির/বাংলাদেশের নারী ও অন্যান্য প্রবন্ধ/ হাসিনা আহম্মেদ অনুদিত প্রকাশক ঃ পরিচালক সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র ১৯৮৯ পৃষ্ঠা

১১। ডঃ সেলিম জাহান পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৬

আশা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুব ঃ

Asa-Self-Reliant Development model

Asa-Self-Reliant Development model in practice

Poverty alleviation through self-relinat approach.

Bottom-line an alternative practice towards empowerment. (Action-reflection report July 1989-June 1991)

Statical year book 1994 December)

আশার অফিসিয়ালদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নমালা ঃ

নাম ঃ , বয়স , স্বামীর নাম ঃ বয়স ,

সন্তান সংখ্যা ঃ , বয়স ঃ , স্কুল–কলেজগামী কিনা? , জমির পরিমাণ ।

১। আপনি আশার খবর পেলেন কেমন করে? আশা আপনাদের নিয়ে কি করেছে?

২। আশার নিকট থেকে ঋণ নিয়ে আপনি কি করেছেন? কেমন চলছে আপনার বর্তমান জীবন?

৩। ঋণের মাধ্যমে আপনি আপনার ভবিষ্যত জীবন নিয়ে কতটা আশাবাদী?

৪। আপনি কি বলতে পারেন আশা যে ঋণের টাকা আপনাদের দেয় তা কোথেকে পায়?

৫। ঋণ প্রদান ছাড়া আশা আপনাদের নিয়ে আর কি করে? আপনি কি মনে করেন ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে আপনাদের পরিবারে কিংবা সমাজে মর্যাদা বেড়েছে না কমেছে।

৬। গ্রামের ধর্মপ্রান কিংবা ক্ষমতাবান ব্যক্তি ঋন নিতে বাধা প্রদান করলে আপনারা কি করবেন ?

৭। আশা ঋণ দেয়া বন্ধ করলে আপনি কি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, যেমন আছেন তেমনই চলবে?